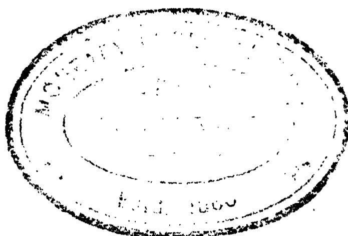
জয়তু নেতাজী

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
প্রণীত





জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৩৫৩

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
মূল্য তিন টাকা
৯ই মাঘ, ১৩৫৩
নেতাজীর একপঞ্চাশৎ জন্মদিন

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ, কর্তৃক মুদ্রিত

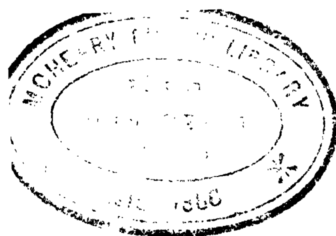
নেতাজীর পরম-প্রিয় পরমাত্মীয়

ভারতের সর্ব্বজাতি

ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের

স্বাধীনতাকামী জনগণের

উদ্দেশে

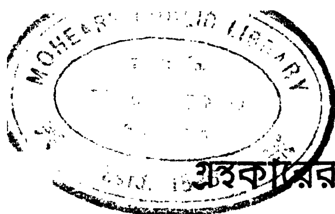


"তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর, পূর্ণ করো,
ঐ-যে দেখি বসুন্ধরা কাঁপল থরো থরো ॥
বাজল তূর্য্য আকাশ পথে,
সূর্য্য আসেন অগ্নি-রথে,
এই প্রভাতে দখিন হাতে বিজয়-খড়্গ ধরো ॥
ধর্ম্ম তোমার সহায়, তোমার সহায় বিশ্ববাণী
অমর বীর্য্য সহায় তোমার, সহায় বজ্রপাণি ।
দুর্গম পথ সগৌরবে
তোমার চরণ চিহ্ন লবে,
চিত্তে অভয় বর্ম্ম তোমার বক্ষে তাহাই পরো ॥"

সূচী

Let us therefore be perfectly plain and brutally frank despite the danger of treading on others' corns. Nothing will be gained by mincing matters in this fateful hour of our national history. Such resolutions of the Working Committee are mere verbosity calculated to hoodwink and bluff the innocent people of this country.

—সুভাষচন্দ্র



গ্রন্থকারের নিবেদন

ভারত-ইতিহাসের বর্ত্তমান সন্ধিক্ষণে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত একজন পুরুষের আবির্ভাব কেমন করিয়া সম্ভব হইল ও তাহার কি প্রয়োজন ছিল, এই পুস্তকে তাহাই বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত নেতাজীর জীবন-কথা, কীর্ত্তি ও চরিত্র সম্বন্ধে অনেক ছোট বড় পুস্তক বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় রচিত হইয়াছে, কিন্তু সে সকলের উদ্দেশ্য অন্যরূপ—তাহাতে, ইংরেজীতে যাহাকে 'mission' বলে, সুভাষ-চন্দ্রের সেই mission বা তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক তাহারই আলোকে তাঁহার চরিত্র ও প্রতিভার ব্যাখ্যা কেহ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। যে রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে তিনি একরূপ অবিশ্রামে তাঁহার যোদ্ধ-জীবন যাপন করিয়াছিলেন, মুখ্যত তাহারই পটভূমিকায় তাঁহার সেই ব্রত ও তাহার সাধন-মন্ত্র বুঝিয়া লইতে হইবে; আবার, সকল দ্বন্দ্ব, সকল ঝড়ঝঞ্ঝার ঊর্দ্ধে সেই পুরুষের যে মুক্ত-আত্মা, স্থিরদীপ্ত নক্ষত্রের মত নিঃসঙ্গ নৈঃশব্দ্যে আপনাতে-আপনি পূর্ণ হইয়া বিরাজ করিত, তাহার রহস্য-গভীর মহিমাও স্মরণ রাখিতে হইবে। কারণ, সুভাষচন্দ্রের মত পুরুষ কোন একটা ব্রত-পালনের দৃষ্টান্তই নহে—সে জীবন তদপেক্ষা মহত্তর ও গূঢ়তর সত্যের ইঙ্গিত-স্বরূপ।

তাই, আমি সুভাষচন্দ্রের সেই সমগ্র পরিচয় আমার সাধ্যমত অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। ব্যক্তিকে বুঝিবার জন্য, দেশ ও কালের পরিবেষ্টনী এবং জাতির পূর্ব্ব-সাধনার ধারাটিকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়াছি, কারণ সুভাষচন্দ্রও যে একটা জাতি ও যুগের মুখ্য প্রতিনিধি তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই তথ্য ও তত্ত্বের আলোচনায় আমি, যতদূর সম্ভব ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই, জাতীয় চরিত্রের অন্তর্নিহিত প্রেরণাও

বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, এবং তাহারই অভিনব ও যুগোচিত অভিব্যক্তি-রূপে আমি ঐ চরিত্র ও ঐ প্রতিভার ব্যাখ্যা করিয়াছি। ইহার প্রয়োজন ছিল; কারণ, সুভাষচন্দ্র ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট-নীতিকে জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন; সেই নীতি এমনই যে, তাহার শক্তি ও দীপ্তি যেমন সকলকে সচকিত করিয়াছিল, তেমনই অপর একটা পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত ও বহুজন-বন্দিত নীতিকে আক্রমণ করিয়া তাহার সুস্পষ্ট প্রতিবাদরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই নীতিই সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার মনোময় বিগ্রহ। এজন্য সুভাষচন্দ্রকে চিনিতে ও বুঝিতে হইলে, গান্ধী-কংগ্রেসের সহিত তাঁহার যে বিরোধ, তাহার স্বরূপ ও মূলকারণ উত্তমরূপে অনুধাবন করিতে হইবে, তাহাতেই সেই নীতি অতিশয় সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

এই পুস্তকে সেই বিরোধের তথ্য ও তত্ত্বঘটিত আলোচনা আমি একটু বিশেষভাবেই করিয়াছি, এবং সেই সঙ্গে, সুভাষচন্দ্রকে বুঝিবার জন্য, অথবা আমি যতটুকু বুঝিয়াছি তাহারই সাক্ষ্যস্বরূপ, কয়েকটি প্রধান তথ্য অবলম্বন করিয়া, অতিশয় সহজ যুক্তি ও ঘটনা-প্রমাণে সেই বিরোধের যে বিবৃতি ও ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা আজিকার দিনে অধিকাংশ পাঠকের প্রীতিকর হইবে না জানি; কিন্তু আমার গত্যন্তর ছিল না, কারণ সত্যের অপলাপ করিলে সুভাষচন্দ্রকেও মিথ্যার দ্বারা কলঙ্কিত করিতে হয়; নেতাজীকে যাঁহারা সত্যই শ্রদ্ধা করেন তাঁহারা ইহা মনে রাখিবেন। কিন্তু প্রতিকার যে হইবে না তাহার কারণ চিন্তা করিলে আরও দুঃখিত হইতে হয়। প্রথমতঃ, কংগ্রেসের গান্ধীবাদ এখন একটা ধর্ম্মমতের মত জনসাধারণের চিত্ত অধিকার করিয়াছে, এবং ধর্ম্মবিশ্বাস-মাত্রেই অন্ধ, তাহা কোন যুক্তি মানে না, যুক্তি চাহে না। দ্বিতীয়তঃ, দেশের সকল পত্র ও পত্রিকা গান্ধীমতাবলম্বী; এই সকল

পত্রিকার নিরবচ্ছিন্ন প্রোপাগ্যাণ্ডা এমন সংস্কারের সৃষ্টি করিয়াছে যে, তদ্দ্বারা যুক্তিনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ, সত্যপিপাসু ব্যক্তিগণও বিভ্রান্ত হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ, অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, জনসাধারণের জন্য এমন-কোন দলভাব-মুক্ত পত্রিকা নাই যাহাতে সমালোচনার নিরপেক্ষতা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। অথচ, যত সত্যই হোক, সকল মতেরই একটা প্রতিবাদী মত থাকিবে, এবং থাকাই উচিত, না থাকিলে জাতি বা সমাজের মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কিন্তু এক্ষণে এ দেশে ঐ এক-ধর্ম্ম ও এক-মত ব্যতিরেকে আর কিছুই প্রচারিত হইতে পারিবে না। বেশ বুঝিতে পারা যায়, এই প্রোপাগ্যাণ্ডার পশ্চাতে একটা বিরাট ব্যবসায়ী-চক্রান্ত বা অর্থনৈতিক প্রভুত্ব আছে। ইহাতেও প্রমাণ হয় যে, ঐ কংগ্রেস-নীতির মধ্যেই এমন কিছু আছে যাহা ছোট-বড় সকল সুবিধা-বাদীগণের পক্ষে বড়ই হিতকর। আমি এমনও দেখিয়াছি যে, সাহিত্যের ব্যবসায়ে লাভবান হইবার জন্য, অতিশয় অর্থলোলুপ ব্যক্তি, সাহিত্যধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, অতিশয় সমারোহসহকারে কংগ্রেসের খাতায় নাম লিখাইয়াছে। বাংলাদেশে, এই সুবিধাবাদই কংগ্রেস-ধর্ম্মকে দৃঢ়মূল করিয়াছে, এ কথা যে সত্য তাহা প্রমাণ করিতে বেশিদূর যাইতে হইবে না—বাংলাদেশে যাঁহারা ঐ ধর্ম্মের পাণ্ডা তাঁহাদের বাহিরের নর্ত্তন ও ভিতরের কীর্ত্তন মিলাইয়া দেখিলেই তাহাতে আর সন্দেহ থাকিবে না। ঐ প্রোপাগ্যাণ্ডা এমনই নিশ্ছিদ্র ও সংঘবদ্ধ যে আজিকার এই দারুণ দুর্গতির মধ্যেও বাঙালীর মুখ বন্ধ রাখা হইয়াছে, তাহার বুকের বেদনা ও মনের প্রকৃত ভাব প্রকাশ পাইতেছে না। কোন পত্রিকাই সত্য কথা বলিবে না, বরং, তাঁতিকুল ও বৈষ্ণবকুল দুইকুলই রক্ষা করিবার জন্য, কেহ কেহ যেরূপ চতুরতার কসরৎ করিয়া থাকে, তাহা যেমন শোচনীয় তেমনই হাস্যকর।

চতুর্থতঃ সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের রোমান্টিক কীর্ত্তি-কাহিনীই বাঙালীকে তথা ভারতবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছে, কিন্তু সুভাষ-জীবনের আগুন্ত, তাঁহার সেই মহাযজ্ঞের উদয়ন বা আরম্ভ-কাহিনী প্রায় অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে; বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের সহিত তাঁহার সেই বিরোধ—সেই বিরোধের কারণ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে, জনসাধারণ প্রায় অজ্ঞ। এই অজ্ঞতার হেতু কি তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। সেই স্মৃতিকে জন-চিত্ত হইতে মুছিয়া ফেলাই যাহাদের একান্ত প্রয়োজন, তাহারাই, সুভাষচন্দ্রের আজীবন একনিষ্ঠ প্রয়াস—আসন্ন ও নিশ্চিত সর্ব্বনাশ হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার সেই আকুল আগ্রহ, এবং তাহারই প্রতিমুখে কংগ্রেসের সর্ব্বশক্তি-নিয়োগ—ত্রিপুরীর সেই কলঙ্ককাহিনী—এখনও মৃত্তিকাতলে পিহিত রাখিয়াছে। আমি এই পুস্তকে, সেই কাহিনীর যেটুকু অত্যাবশ্যক তাহাই পুনরুদ্ধার করিয়াছি; অত্যাবশ্যক এইজন্য যে, ঐ কাহিনীতেই আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের নেতাজীকে—মেঘাচ্ছন্ন হইলেও, নবোদিত সূর্য্যের মত দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমি বলিয়াছি, গান্ধী-নীতি ও গান্ধী-কংগ্রেসের সহিত তাঁহার সেই বিরোধই তাঁহার ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, এই বিরোধকে কোনরূপে ছোট করা বা অস্বীকার করা চলিবে না—সুভাষচন্দ্রের গান্ধী-ভক্তির দোহাই দিয়াও, গান্ধীজী ও সুভাষ উভয়ের মান-রক্ষা করিবার চেষ্টাও নিষ্ফল। পাছে কেহ মনে করেন যে, আমি আমারই ব্যক্তিগত মত বা ধারণার বশে, সুভাষচন্দ্রের উপরে ঐরূপ একটা অনমনীয় মনোভাব আরোপ করিয়াছি, এজন্য আমি এই পুস্তকের 'পরিশিষ্টে' সুভাষচন্দ্রের এমন কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি যাহাতে, আর কিছু না হোক, সুভাষচন্দ্র যে গান্ধীবাদের সহিত কোনরূপ রফা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ মিলিবে।

সুভাষচন্দ্রের স্বকীয় রাজনীতি, তাঁহার বিশ্বাস ও লক্ষ্য কি ছিল, তাহার যথাসাধ্য পরিচয় ও প্রমাণ আমি দিয়াছি; কিন্তু একটি বিষয়ে আমি পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করিতে চাই। তাঁহার সেই মত বা দৃষ্টিভঙ্গি যেমনই হোক, তাহার বিরুদ্ধে যেমন যুক্তিই থাকুক, তিনি ব্রিটিশ জাতির চরিত্র, তাহাদের কঠিন সংকল্প ও গভীর কূট-নীতি সম্বন্ধে যে কিছুমাত্র ভুল করেন নাই, এবং কংগ্রেসের মতি-গতি ও আচার-অনুষ্ঠান, তাহার নীতি ও ধর্ম্ম তিনি উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন, এবং সে সকলের ব্যর্থতাও নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—আজিকার অবস্থা-দৃষ্টে তাহা সকলেই স্বীকার করিবে; আমি সুভাষচন্দ্রের সেইসকল সমালোচনা ও ভবিষ্যৎ-বাণী মিলাইয়া দেখিতে বলি। কংগ্রেসের সেই সংগ্রাম-ভীরু আপোষ-নীতি এতদিন তাহার কর্ম্মনাশ করিতেছিল, এক্ষণে ধর্ম্মনাশ করিতেছে।. আজ দেশে যে গুরুতর সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে কেহ ভাবিতেও পারে নাই, তাহার কারণ, কংগ্রেসের. সেই ধর্ম্মনীতিকেই উৎকৃষ্ট রাজনীতি ও দূরদর্শিতার প্রমাণ বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিয়াছিল। কিন্তু আজিকার এই ভূমিকম্পে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি-মাত্রেরই দৃষ্টিভ্রম ঘুচিবে; ইহা যে কংগ্রেসের সেই ভ্রান্ত-নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল, এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম যে অতঃপর নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু কংগ্রেস এমনই মোহগ্রস্ত হইয়াছে, এমনই সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান হারাইয়াছে যে, এখনও সে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে যে, এ সকলই আসন্ন স্বাধীনতা-লাভের লক্ষণ! কিন্তু জনগণ কি দেখিতেছে? চতুর্দ্দিকের ঘটনা-প্রমাণে যে অবিসংবাদিত সত্যকে তাহারা সহজবুদ্ধিতে প্রত্যক্ষ করিতেছে, কেবল বাক্যের কূট-কৌশলে তাহাকে অস্বীকার করে কেমন করিয়া? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঠিক ইহাই যে ঘটিবে, এবং গান্ধী-

কংগ্রেসও যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তাহা সুভাষচন্দ্র অতিপূর্ব্বেই দৃঢ়কণ্ঠে ও নিঃসংশয়ে প্রচার করিয়াছিলেন; তখন কেহ বিশ্বাস করে নাই, আজ তাহা বেদবাক্যের মতই অভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই মনে হয়, যখন দেশের সকলেই ঘুমাইতেছিল, তখন ঐ একমাত্র পুরুষ নিজের অন্তর-দীপটি জ্বালাইয়া জাগিয়া বসিয়াছিলেন, কারণ—"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী"। আমি তাঁহার সেই বাণীগুলির প্রতিও বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি হয় ত' এখনও তদ্দ্বারা মোহাচ্ছন্নের চৈতন্য হইতে পারে।

নেতাজীর নীতি ও নেতৃত্বের মূলে যে একটা বিশিষ্ট জাতি-ধর্ম্ম বা সাধনামূলক সংস্কৃতির প্রেরণা আছে, এই পুস্তকে আমি তাহাও বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছি। বাঙালী পাঠককে সে বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে, কারণ, ধর্ম্মের দিক দিয়াও ঐ নীতির সহিত গান্ধী-নীতির প্রত্যক্ষ বিরোধ আছে। গান্ধীজীর ধর্ম্ম আধুনিক ভারতের ধর্ম্ম হইবার উপযোগী কি না, তাহা মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিকতারই অধিকতর অনুকূল কি না—আত্মনিগ্রহ এবং ব্রত-উপবাস-ভজন প্রভৃতির বৈরাগ্যমূলক সেই সন্ন্যাসের আদর্শ আধুনিক জীবনের আদর্শ হইতে পারে কি না, ইহাও চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। বাঙালীই ধর্ম্মের ঐরূপ আদর্শ-বিষয়ে, ভারতের অন্য সকল জাতি হইতে চিরদিনই কিছু স্বতন্ত্র; সেই আধ্যাত্মিক আদর্শকেও আধিভৌতিকের সহিত মিলাইয়া, একটা পূর্ণতর জীবন-বাদকে ধরিয়া থাকাই তাহার প্রতিভার বিশিষ্ট লক্ষণ। 'বাংলার নবযুগ' নামক গ্রন্থে আমি ইহার বিস্তারিত বিচারণা করিয়াছি, এখানে এই প্রসঙ্গে পুনরায় দুই চারিটি কথা বলিব। বাঙালীই পুনরায় সেই আধ্যাত্মিকতাকে, নবযুগের প্রয়োজনে, একটি নূতন রূপে, মানুষের দেহ-মনের বাস্তব ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিয়াছে। এই ধর্ম্মের নাম—

দেশ-ও-জাতি-প্রেম, ইহার সাধনায় শক্তিই মুখ্য। ইহা যেমন নিখিল-মানব-প্রেম নয়, তেমনই তাহার বিরোধীও নয়; ইহা অহিংসা বা উপবাসের ধর্ম্মও নহে। এই ধর্ম্ম বিশেষভাবে বাঙালীজাতির জাতীয় সংস্কারে নিহিত থাকিলেও, ইহাতে সার্ব্বজনীন মানব-প্রকৃতির এমন একটি চিরন্তন সত্য স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, যে তাহাকেও ভারতীয় আদি-হিন্দুধর্ম্ম বা 'সনাতন'-মানবধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, সেই মধ্যযুগীয় আবরণ ভেদ করিয়া এই ধর্ম্মই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। এইরূপে বাঙালীই, যে-ধর্ম্ম প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম—যাহা ব্যাসের সঙ্কলিত 'মহাভারতে' একটি সম্পূর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে সেই ধর্ম্মকে পুনরুদ্ধার করিয়াছে। সেই ধর্ম্ম হইতেই বাঙালী একটা খুব বড় 'nationalism'-এর অনুপ্রাণনা পাইয়াছে; তান্ত্রিক অনার্য্য বাঙালীই আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে মিলনের সেতুযোজনা করিয়া একটা নূতন ও বৃহত্তর মহাভারতের সূচনা করিয়াছে। তাহার সেই তান্ত্রিক শক্তি-প্রীতি ও বৈষ্ণব রস-দৃষ্টি—এই দুই মিলিয়া ঐরূপ ধর্ম্ম-প্রণয়নের সহায় হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম একদিকে আর্য্যের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মতত্ত্ব—মহাভারতের সার-মর্ম্ম—গীতার সেই কর্ম্ম-সন্ন্যাস বা জীবন্মুক্তিবাদকে, এবং অপরদিকে অনার্য্যের ভোগবাদ বা জীবন-সত্য-বাদকে মিলাইয়া একটি অপূর্ব্ব সমন্বয়মূলক জীবন-বাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; তাহাতে শক্তিরূপা প্রকৃতিই একাধারে ভুক্তি ও মুক্তিদায়িনী হইয়াছে। তন্ত্রের সেই শক্তিপূজাকেই ভারতের স্বাজাত্য-সাধনায় প্রয়োগ করিয়া বাঙালী আধুনিক ভারতে এক নবধর্ম্মের গুরু হইয়াছে। এই মন্ত্রের আদি-দ্রষ্টা—বঙ্কিমচন্দ্র, পরে স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে ইহার স্ফুটতর ও পূর্ণতর অভিব্যক্তি হইয়াছে। আদি-কংগ্রেসের সহিত এই ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না,—বঙ্কিম বা বিবেকানন্দ কেহই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন নাই—তাহার কারণ, উহার

মূলে ভারতীয় প্রেরণা ছিল না; গান্ধী-কংগ্রেসও সুভাষচন্দ্রকে আকৃষ্ট করে নাই এই জন্য যে, সেই খাঁটি ভারতীয় ধর্ম্মের সুস্থ ও প্রাণময় প্রেরণা উহাতে নাই; উহা প্রাণধর্ম্মী, গতিধর্ম্মী নয়; উহার মূলে আছে সেই মধ্যযুগীয় mysticism—জীবন-সত্যকে অগ্রাহ্য করিয়া একটা অবাস্তব ভাব-সাধনার মোহ, গীতা যাহাকে 'ক্লৈব্য' বলিয়াছেন সেই ক্লৈব্যেরই জয়গান। একমাত্র মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর টিলক বাংলার এই নব-জাগরণকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তিনি এই ধর্ম্মের সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গীতা-ভাষ্য—সেই 'গীতা-রহস্য' নামক বিশাল গ্রন্থে, তিনি হিন্দুধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে সেই ধর্ম্মকে —'নিবৃত্তিপর' নয়—'প্রবৃত্তিপর' বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন; তিনি শ্রীকৃষ্ণের 'তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত' এই উপদেশকে মধ্যযুগীয় ভক্তি-বৈরাগ্যের দুর্ব্যাখ্যা হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

বাংলাদেশেই সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক বিক্ষোভ আরম্ভ হয়, তাহার মূলে ছিল বঙ্কিম-বিবেকানন্দের বাণী। সেই নব ধর্ম্মাবেগের আঘাতে আদি-কংগ্রেস ভাঙিতে আরম্ভ করে; সেই সময়েই বাঙালীর সেই ধর্ম্মমন্ত্র বীজ-রূপে ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাহা অঙ্কুরিত হয়। তখন হইতেই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে আরব্ধ হয়, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষও রীতিমত চঞ্চল হইয়া উঠে; এবং তখন হইতেই একদিকে যতরকমের তথাকথিত reforms এবং অপরদিকে কঠোর দমন-নীতি তাহাদের রাজ্যরক্ষার প্রধান উপায় হইয়া আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর, পৃথিবীর সকল দেশের মত, এদেশেও বিষম অবস্থান্তর ও অবসাদ ঘটে। সেই লগ্নে গান্ধীজী তাঁহার নূতন ধর্ম্ম ও নূতন কর্ম্ম-নীতি লইয়া ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন, সেই দারুণ অবসাদ ও নিরাশা তাঁহার নেতৃত্বের বড়ই অনুকূল হইয়াছিল, তিনি

হইয়াছিলেন—'The man of the moment'। সেই স্বাজাত্যবাদ ও শক্তিবাদকে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী করিয়া, তিনি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে যে পথে প্রবর্ত্তিত করিলেন তাহাতে বাঙালীর স্থান আর রহিল না—সঙ্গে সঙ্গে সেই জীবন-বাদ, সেই শক্তিবাদ, সেই মহাভারতীয় হিন্দুধর্ম্মও পুনরায় মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিকতা বা ক্লীব-বৈরাগ্যের দ্বারা আচ্ছন্ন বা নিরাকৃত হইয়া গেল। এখানে এ সম্বন্ধে অধিক বলিবার স্থান নাই—ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। আমি কেবল ইহাই বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রেই সেই বাঙালী-ধর্ম্ম ও বাঙালী-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, তিনিই নবযুগের মানব-ধর্ম্মকে স্বাভাবিক ও সার্ব্বজনীন ভিত্তির উপরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, শুধুই ভারতের হিন্দুকে নয়, মুসলমানকেও, মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন। এই বাংলাদেশে বাঙালীই সে পথের সন্ধান করিয়াছে—সেই যে "দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি," তাহাকে সুগম করিয়াছে, এবং সারাভারতকে সেই পথে চলিতে আহ্বান করিয়াছে। গান্ধী-ধর্ম্ম স্বাভাবিক মনুষ্য-ধর্ম্ম নহে বলিয়া বরং তাহা প্রকৃতি সম্বন্ধে নাস্তিক এবং একটা মিষ্টিক (mystic) অধ্যাত্মবাদে অন্ধবিশ্বাসী বলিয়া, হিন্দু-মুসলমান কাহারও ধর্ম্ম হইতে পারে না ; সেই ধর্ম্ম যেমন যুগোচিত নয়, তেমনই তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সমন্বয়-বিমুখ বলিয়া—সত্যও নহে। সুভাষচন্দ্রও, বিবেকানন্দের মত, কেবল বাংলার কথাই ভাবেন নাই ; তিনি ভারতের সর্ব্বপ্রদেশ, সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বসম্প্রদায়কে এক গভীর ও উদার স্বাজাত্যবোধের দ্বারা—সম-গৌরববোধের দ্বারা (পাপ-মোচন বা হরিজনসেবা দ্বারা নয়), সত্যকার আত্মীয়তা-বন্ধনে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। এই মুক্তির বার্ত্তা বাঙালীই প্রথম হইতে বহন করিয়াছে ; কি হেতু তাহা সম্ভব হইয়াছে, সে কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞে বাঙালীর এই

পৌরোহিত্য সকল সত্যনিষ্ঠ ভারতবাসীই স্বীকার করিবেন (শ্রীযুক্ত সীতারামায়া-রচিত কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাস তাহা করে নাই), যথা—

"In the history of the struggle for Indian Independence Bengal occupies a unique position among the provinces of India. It has not only played a prominent role in strengthening the foundations of the Indian National Congress, but has always made the most valuable contribution towards the fight for the emancipation of the Country. The people of this Country may rightly be called the inspirers of the national movement in India." (Durlab Singh: *The Rebel President.* P. 37.)

কিন্তু আরও একজন পণ্ডিত ও চিন্তাশীল অ-বাঙ্গালী লেখক বাংলা ও বাঙালীর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাও হয় ত' নিতান্ত মিথ্যা নহে—

"This province on the extreme eastern fringe of India has been a problem child. It has a keen resemblance to Catalonia, that hotbed of extremists in Spain, for ever trying to break away from the rest of the Country, and at the sametime trying to assimilate it. . . . One thing however is clear—it has the separatist and rebellius spirit which has inspired Catalonia. And it is essentially paradoxical. For, Bengal, like Catalonia, likes and dislikes the rest of the country. It wants to win it over and yet has often broken loose from it." (Hiralal Seth: *Subhas. C. Bose.* P.17.)

উপরি-উদ্ধৃত উক্তিতে বাঙ্গালী সম্বন্ধে যে দুইটি মন্তব্য আছে, সে দুইটিই গুরুতর; একটি তাহার শাক্ত-মনোবৃত্তি, বা উগ্র, চরমপন্থী প্রকৃতির কথা—লেখক এই অর্থেই বাঙালীকে 'extremist' বলিয়া থাকিবেন। কথাটা মিথ্যা নহে;—কারণ বাঙালী যেমন ভাবুক তেমনই ভাবপ্রবণ, ভাবকে বা তত্ত্বকে সে জীবনের তথ্যরূপে সাক্ষাৎ করিতে চায়। ইহাই তাহার তান্ত্রিকতা, এ বিষয়ে ফরাসী জাতির সহিত তাহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয় মন্তব্যটি আরও গুরুতর, এবং একজন অ-বাঙালীর বলিয়া মূল্যবান। ঐযে 'separatist and rebellious

‹pirit'-উহা ভারতের অপর জাতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, এবং ভাবনারও কারণ হইয়াছে; তাই কি বাঙালীর প্রতি অ-বাঙ্গালী কংগ্রেসের মমতা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে? ঐ স্বাতন্ত্র্য-বোধ বাঙালী জাতির জন্মগত, ইহার কারণ অবশ্যই আছে; কিন্তু সেজন্য পূর্ব্ব-ইতিহাসে কোনরূপ সমস্যার উদ্ভব হয় নাই, আজ হইয়াছে। পূর্ব্বে, বাঙালী তাহার ধর্ম্মগত স্বাতন্ত্র্য বা স্বেচ্ছাচারের জন্য যতই অশ্রদ্ধাভাজন হউক, তাহাতে কাহারও ক্ষতি ছিল না, তখন সে তাহার সেই স্বতন্ত্র-ধর্ম্মকে রাজনীতির বাহন করিয়া সারাভারতকে অনুগামী করিবার দুরাশা পোষণ করিত না। ইহাও সত্য যে, অবশিষ্ট ভারতের অভ্যস্ত সংস্কার ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে তাহার একটা প্রতিকূল মনোভাব আছে, তাই সেই ভারতের আধুনিক সংস্কৃতিকে সে শ্রদ্ধা করে না; কিন্তু প্রাচীন ভারত—সেই গীতা, মহাভারত, সাংখ্য, বেদান্তের ভারতকে সে আপনার ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছে, সেই ভারতের গৌরবে সে আত্মহারা। তাই আজিকার ভারতকে সে অপর এক কারণে বুকে জড়াইয়া ধরিতে চায়। এই বিরাগ ও অনুরাগ দুই-ই সত্য। কিন্তু আজ এমন এক বাঙালীর অভ্যুদয় হইয়াছে যাহার বাঙালীত্বের বিশাল বক্ষে সর্ব্ব-ভারত আলিঙ্গিত হইয়াছে; যে, বাঙালী হইয়াও আর বাঙালী নয়—বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে একদেহে পরিণত করিয়া সে তাহারই প্রাণরূপে স্পন্দিত হইতেছে! তাই আশা হয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্রেরই জয় হইবে, তাঁহার সেই মহাজাতি-প্রেম সমগ্র ভারতকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনরুত্থিত করিবে

বাগনান, বি-এন্-আর,

১২ই, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩।

জয়তু নেতাজী

নব "পুরুষ-সূক্ত" বা নেতাজী-বরণ

বেদের বিখ্যাত পুরুষ-সূক্তের নামে এই প্রবন্ধের নামকরণ করিয়াছি। ঐ পুরুষ-সূক্তে যে, পুরুষ-যজ্ঞের বিবরণ আছে তাহা স্মরণ করিলেই আপনারা আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন। আচার্য্য ত্রিবেদীর ভাষায় আমি সেই যজ্ঞের বিবরণ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারটাই একটা যজ্ঞ; স্বয়ং বিরাট-পুরুষ স্বেচ্ছায় এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন।....বিরাট-পুরুষ আপনাকেই ত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনাকেই আহুতি দিয়াছিলেন।....বিরাট-পুরুষ কেবলই আপনাকে ত্যাগ করিতেছেন, কেবলই আপনাকে নিহত করিতেছেন, অথচ তিনি নিহত হইতেছেন না। তাঁহার এই যে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ, তাহা একদিনের অনুষ্ঠান নহে—মহাকাল ব্যাপিয়া চলিতেছে। এই যজ্ঞের প্রায়ণও নাই, উদয়নও নাই; আরম্ভও নাই, সমাপ্তিও নাই, কেন না এই যজ্ঞই ত বিশ্ব-ব্যাপার।........

এই আত্মাহুতিকে আমরা মৃত্যু বলি; এই আত্মাহুতির বিরাম বা অন্ত নাই; মৃত্যুরও বিরাম বা অন্ত নাই। প্রজাপতি আপনাকে ত্যাগ দ্বারা নিহত করিতেছেন, যজমানও আপনাকে ত্যাগ দ্বারা নিহত করিতেছেন। প্রজাপতি মৃত্যুস্বরূপ, যজমানও মৃত্যুস্বরূপ। এই মৃত্যুর অন্ত নাই; কেন না, এই মৃত্যুর দ্বারা অমরতা পাওয়া যায়। প্রজাপতি মৃত্যুঞ্জয়, যজমানও মৃত্যুঞ্জয়ী।" [যজ্ঞকথা পৃঃ ১৬০—৬৭]

আমি এই পুরুষ-যজ্ঞকেই—যাহা অনন্তকালে অনুষ্ঠিত হইতেছে—তাহাকেই, একালে আমাদের চক্ষের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিতেছি; আমাদের কালের আমাদের ভাষায় তাহার ব্যাখ্যাও অন্যরূপ, কিন্তু ভিতরের ঘটনা একই। অতএব উপরের নামকরণ দেখিয়া আপনারা বিস্মিত হইবেন না একালের ঋষিকবিও সেই যজ্ঞের পুরুষ-সূক্ত রচনা করিয়াছেন, সেইরূপ দুইটি সূক্তই আমাকে এই প্রবন্ধ রচনারূপ 'চাপলায় প্রণোদিত' করিয়াছে। আমি সেই সূত্র দুইটি উদ্ধৃত করিয়া আধুনিক ভাবে ও আধুনিক ভাষায় তাহার কিছু ভাষ্য রচনা করিব, আপনারা পাঠ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করুন, আমার ভাগও আপনারাই গ্রহণ করুন। প্রথমে একটু ভূমিকা করি।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন, তেমনই এক একটা জাতির জীবনে, এমন ঘটনা ঘটে, যাহা অতিশয় অপ্রত্যাশিত ও চমকপ্রদ; ব্যক্তির জীবনে ঘটিলে তাহার সংবাদ কেহ রাখে না, তাহা একটি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই শেষ হইয়া থাকে। নাটকে উপন্যাসে এইরূপ ঘটনাকেই আশ্রয় করিয়া কবি-কল্পনা কিঞ্চিৎ স্ফূর্তি পায়; আমরা তেমন ঘটনাকে মানিয়া লই; তেমন ঘটনা নিত্য না ঘটিলেও অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না, একটা গভীরতর অর্থে তাহাকে বাস্তব বলিয়া স্বীকার করি, এবং কবির-কল্পনা বা অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করি। কিন্তু সময়ে সময়ে ঐ কবি-চিত্তকেই অপর একটি চেতনা আবিষ্ট করে—ব্যক্তি-জীবনের পরিবর্তে বৃহত্তর জীবন, জাতির বা মনুষ্য-সাধারণের নিয়তি—

যেন সেই চেতনায় চমকিয়া ওঠে; তখন তিনি এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনাকে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করেন, এবং কালান্তরে ও দেশান্তরে সেই ঘটনা ঘটিতেও দেখা যায়। নটরাজরূপী মহাকাল নৃত্যের মধ্যেই যেখানে পা তুলিয়া যতি-তাল রক্ষা করেন, এ যেন সেই মুহূর্ত্তেরই একটি ঘটনা; কবিও দিব্য আবেশের পরমক্ষণে মহাকালের সেই চকিত চরণপাত নিজ হৃদয়ে অনুভব করেন, সেই মুহূর্ত্তে তিনি ঋষি হইয়া উঠেন; ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান যেখানে এক হইয়া আছে সেইখানে তাঁহার চিৎ-পদ্ম উন্মীলিত হয়, কণ্ঠে দিব্যবাণীর অধিষ্ঠান হয়। ঐ যে ঘটনা উহা নিত্য ঘটে না বটে, তথাপি উহা নিত্যকালের; এইজন্যই উহার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান নাই; যখন উহা সত্যই কোনকালে ঘটে, তখনই আমরা বুঝিতে পারি—এ ঘটনা কালাতিগ, উহার ইতিহাস স্বতন্ত্র। এইরূপ ঘটনার যে ইতিহাস, আমাদের দেশে তাহাকে 'পুরাণ' বলে; তাহাতে কালের পৃথক পদচিহ্নের হিসাব থাকে না—বৃহত্তর গতিচ্ছন্দই ধরা পড়ে। এই অর্থে মহাভারতও ইতিহাস; কিন্তু তাহা সন-তারিখের ইতিহাস নয়, কালের শাশ্বত তরঙ্গধারার ইতিহাস। ইহাকে বাস্তব বা কল্পনা—কোন নামই দেওয়া যায় না। কবিচিত্তে দেশ ও কাল যখন এক হইয়া যায়, যখন এক দিব্য আবেশের ক্ষণে তাঁহার চক্ষে মানবেতিহাসের বহিরাবরণ খুলিয়া যায়, তখন তিনি এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন—যাহা নিত্যকার ঘটনারাশির যেন একটা পুঞ্জীভূত রূপ, এক একটা মন্বন্তর বা যুগান্তরের প্রতীক। তখন

সেই কবির দৃষ্টি, তাঁহার সেই বাণী আমাদিগকে চমকিত করে, তাঁহার সেই বাণীকে আমরা ভবিষ্যৎ-বাণী বলিয়াই মনে করি; কিন্তু আসলে তাহা ভবিষ্যৎ বাণী নয়—শাশ্বত সত্যের বাণী। তাঁহার সেই কাব্যে আমরা মহাকালের সেই নৃত্যচ্ছন্দই হৃদয়-গোচর করি।

আমি যে উপস্থিত কোন্ ঘটনার কথা বলিতেছি তাহ আপনারা বোধ হয় ইতিমধ্যে অনুমান করিয়াছেন; বর্ত্তমানে আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারত যাহা দেখিয়া শুধুই উচ্চকি নয়—উজ্জীবিত হইয়াছে, আমি সেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার আজাদী ফৌজের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির কথাই বলিতেছি আজ এই ঘটনার কথা সকলেই জানেন, অতঃপর ইহার ইতিহাস রচনাও হইবে; কিন্তু এ ঘটনার ঋক-মন্ত্র-গাথা পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছে—সাহিত্যিক আমি তাহাতেই অধিকতর বিস্মিত হইয়াছি। একটি আমাদের ভাষায় আমাদেরই কবির রচিত—তাহার কথা পরে বলিব; আর একটি এক ইংরেজ কবির রচনা। যে দুই জাতি পরস্পর বিপক্ষ হইয়া এই ঘটনা-নাট্যের অভিনয় করিতেছে, ঠিক সেই দুই জাতির দুই কবি-প্রতিনিধি এই যজ্ঞের সামমন্ত্র রচনা করিয়াছেন—ইহাও একটি আশ্চর্য্য যোগাযোগ বটে। সুইনবার্নের যে কবিতাটিকে এইরূপ দিব্য প্রেরণার উদ্গীথ বলিয়া মনে হয় বাংলা ছন্দে তাহার সেই বাণীরূপ ও উদাত্ত-গম্ভীর ছন্দধ্বনি ধরা যাইবে না, তথাপি আমি এককালে এই কবিতাটির যে

বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলাম, তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। মূল কবিতাটির নাম—"Super Flumina Babylonis" অনেকদিন পূর্ব্বে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল—তখন কে জানিত তাহা এই ঘটনারই ভবিষ্যৎ-বাণী! এই কবিতায় ইংরেজ কবি, য়িহুদী ইতিহাসের একটি ঘটনাকে ভাব-ব্যঞ্জনার সহায় করিয়া, অস্ট্রিয়ার পদানত ও অত্যাচার-ড়িত তদানীন্তন ইটালির স্বাধীনতা-সংগ্রামকে মহিমান্বিত করিয়াছেন এবং ইটালির বীর সন্তানগণের জবানীতেই ইহা রচনা করিয়াছেন—ভারতীয় আজাদী ফৌজের উদ্দেশে নয়; কিন্তু কে বলিবে, এ কবিতায় আজিকার ঐ ঘটনাই আরও সত্য ও পূর্ণতর রূপে কীর্ত্তিত হয় নাই? কবিতাটির আরম্ভ ইরূপ—

বিদেশের নদীকূলে বসিয়া সকলে মোরা
স্মরিনু তোমায় তিতি' অশ্রুনীরে,—
বন্দী ছিনু পরবাসে, যুগান্ত-যাতনা সহি'
তুমি অসহায় চাহ নাই ফিরে'।

* * *

বিদেশের নদীকূলে দাঁড়ায়ে উঠিনু মোরা,
গাহিলাম গান—নূতন রাগিণী,
গাহিলাম—ওই শোন জননীর মুক্তিভেরী!
হ'ল অবসান যন্ত্রণা-যামিনী!

কবি এ কাহাদের কথা বলিতেছেন ? এই নূতন রাগিণীর নূতন গান ঠিক এমনই অবস্থায় কাহাদের কণ্ঠে উৎসারি হইয়াছিল ?

ঘুরেছিনু তব লাগি' কতদূর দূরান্তরে,
বিজন শ্মশানে, রুদ্র পিপাসায়,
চিত্তে জ্বালি' চিতানল ফিরেছিনু দিশে দিশে
জলের সন্ধানে—বুক ফেটে যায় !

—এই 'রুদ্র-পিপাসা' এবং 'দিশে দিশে জলের সন্ধান' ইহাও কি অক্ষরে অক্ষরে সত্য নয় ? তারপর—

শুনেছিনু রূঢ় বাণী—"জানি বটে, হৃদপিণ্ড
কঠিন তুহার, তবু হ'বি নত !
তোরা দাস, দাসীপুত্র—তুহাদের বেত্রদণ্ড,
উঞ্ছ কর্ম্মভার,—প্রভুসেবা-ব্রত !

—এই শ্লোকে দাসত্বের যে নিদারুণ অপমান এবং মানবাত্মার যে লাঞ্ছনার কথা রহিয়াছে, তাহা ঐ অবস্থায় সকল জাতির পক্ষেই সত্য বটে ; কিন্তু আজ ঠিক এই দিনে এ জাতির পক্ষে সে সত যে ভাবে চাক্ষুষ হইয়া উঠিয়াছে—এমন কি আর কোথা কখনো হইয়াছিল ? আজাদ হিন্দ ফৌজের যে বিচার চলিতেছে তাহা ত' আর কিছুই নয়—দাস-জাতির সেই স্পর্দ্ধার শাস্তিদান বেত্রদণ্ড, উঞ্ছ কর্ম্মভার এবং প্রভুসেবা-ব্রত ছাড়া সে যে আর কিছুই প্রত্যাশা করিবে না—করাই যে মহা অপরাধ ইহার পর, সহসা এই জাতির মধ্যে কেমন করিয়া নব জাগরণের

াাড়া আসিল, জাতির যেন নবজন্ম হইল—এই কবিতায় সে র্ণনাও কম সার্থক হয় নাই!—

তব তটিনীর তটে নগর-নগরী যত
নাগরীর বেশে মগ্ন নিরন্তর
দিবা-স্বপ্ন নৃত্যগীতে, যতদিন না উদিল
দীর্ঘ নিশাশেষে সৌভাগ্য-ভাস্কর।

ফুল-হিন্দোলায় শুয়ে সুখতন্দ্রারত সবে
চন্দ্রাতপতলে—ওষ্ঠে মৃদু জ্বালা;
ললাটে কলঙ্ক, তবু কুঞ্চিত কুন্তলদাম—
পরিয়াছে গলে মল্লিকার মালা।

তারা কভু হেরে নাই তব গিরি-নদীতীর—
পিতৃপিতামহ-পরিচয়হারা!
ভুলেছিল শক্তিমন্ত্র—ইষ্ট দেবদেবীগণে,
ছিল অহরহ মধু-মাতুয়ারা!

তব নদনদীপথে শুষ্ক খাতে যবে পুনঃ
আইল জুয়ার তীব্র তৃষাহরা—
মিথ্যার মুকুট খুলি' ফেলিল ধূলায় টানি'—
সন্তান তুহার—কলঙ্ক-পসরা।

আজ আমরা দিকে দিকে কেবল ইহাই দেখিতেছি, যত দিন াইবে ততই দেখিব।

কিন্তু এই কবিতার যে অংশ পড়িলে সত্যই রোমাঞ্চ হয় তাহা পরের পংক্তিগুলিতে এক মহাপুরুষের কথা—সে যে কে, আজ আর কোন ভারতবাসীকে তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। কবিতার এই অংশের একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। জীবন্ত সমাধি হইয়াছে যে দেশমাতৃকার তাঁহার সেই সমাধি-গহ্বরের রুদ্ধদ্বার সমীপে পৌঁছিয়া বীর সন্তানগণ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিল—গহ্বর-দ্বারের সেই প্রকাণ্ড প্রস্তর-কপাট কে খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং সেই কপাটের উপর দাঁড়াইয়া এক দিব্যদর্শন পুরুষ! সেই পুরুষ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে বাণী উচ্চারণ করিল তেমন বাণী তাহারা পূর্ব্বে কখনো শোনে নাই। সেই আহ্বান-বাণী এইরূপ—

'হের দেখ, জননীর দেহ হ'তে ঘুচিয়াছে
প্রেতের বসন শ্মশান আগারে,
পিশাচ-প্রহরী যত মন্ত্রৌষধিবশে যেন
ঘুমে অচেতন স্বপন-বিকারে!

'হের হেথা শূন্য শয্যা! স্বর্ণজ্যোতি-কিরীটিনী
অনিন্দ্যসুন্দরী নাহি যে শয়ান।
মাতা আর মৃতা নয়! ভুবন-ললাম সে যে
রাজ-রাজেশ্বরী! মুছ দু'নয়ান!'

নেতাজীর বাণী যাহারা স্বকর্ণে শুনিয়াছে, তাহারাই বলিবে এ

কাহার কণ্ঠস্বর; সেই পুরুষ-দেবতাই তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"সেই মাতা কহিছেন কণ্ঠে মোর, তোমা সবে,
কর্ণে—মর্ম্মমূলে আজি এ বারতা—
কোরো না বিশ্বাস কেহ আভিজাত-জনে কভু,
কিম্বা রাজকুলে, রাজাদের কথা।

ইহাই কি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার একমাত্র সতর্ক-বাণী নয়? আজ এখনও সেই সতর্ক-বাণীর আবশ্যকতা সমান রহিয়াছে—এমনই আমাদের মূঢ়তা! ইহার পর কবি সেই পুরুষের কণ্ঠে মৃত্যুজয়ের মহামন্ত্র উচ্চারণ করাইয়াছেন—

"নিজ কর্ম্ম-ফল-ভুক্ পুরুষ নিজেই পাতে
নিজ সিংহাসন ধরণীর 'পর,
বিশ্বতরে আত্মপ্রাণ যে বা করে পরিহার,
জেনো সেই জন মরিয়া অমর।

"মিটায়ে দিয়েছে সে যে মৃত্যুর সকল দাবী,
আছে তার কিবা শমন-শাসনে?
দু'দিনের বিনিময়ে বরিয়া লয়েছে বীর
অন্তহীন দিবা, অমর্ত্ত্য আসনে।"

ইহাও বেদের সেই পুরুষ-সূক্ত—সেই যজ্ঞ ও যজ্ঞের আহুতি-মন্ত্র। এই মৃত্যুই অমৃতের সোপান, এই আত্মাহুতি কখনও

নিষ্ফল হইতে পারে না। এখানেও মানুষকে মানুষের ভাষায় সেই পুরুষ আশ্বাস দিতেছেন—

স্মৃতির হিমাদ্রিশিরে, জীবযাত্রা-উৎস-মূলে,
মানব-মানসে—সে কীর্ত্তি-কিরণ
যে-ঠাঁই যেখানে পড়ে মৃতসঞ্জীবন সেই
প্রাণের পরশে মরিবে মরণ!

যে-দীপ নির্ব্বাণ আজি, বিফল হয়েছে যেই
পুণ্য-অবদান কালকুক্ষিগত—
সেই ব্যথা, ব্যথিতের চন্দ্রানন হারাবে না,
রবে জ্যোতিষ্মান, সুন্দর, শাশ্বত!

এ সকল কথা নূতন নয়, বরং অতিশয় পুরাতন; এ সেই গীতার কথা—'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি', 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ', 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'—'তস্মাৎ যুদ্ধস্ব, ভারত!' কিন্তু কোন্ সত্য পুরাতন নয়? সেই পুরাতনকেই নূতন করিয়া তুলিতে না পারিলে তাহার মূল্যই বা কি? এ বাণী কেবল তাহারই কণ্ঠে জীবন্ত হইয়া উঠে—যে স্বয়ং পুরুষ-যজ্ঞের সেই পুরুষ, যে নিজেকে নিঃশেষে সেই যজ্ঞে আহুতি দিয়াছে।

এই বাণী প্রচারিল দেশ-জাতি-ত্রাতা সেই
দেবতার মুখে, আজও সেই গান

শোনা যায়,—বাঁচিয়া উঠেছি, তাই মৃতপ্রায়া
জননীর বুকে স্তন্য করি' পান।

মায়ের মন্দিরে আর হইবে না পশুযাগ—
বেদীর পাষাণ রবে শুভ্র-শিলা,
বিদেশ-নদীর কূলে কাঁদিব না—দেশে হেথা
আলোর নিশান, দেবতার লীলা!

আজ এ দেশে যাহা ঘটিতেছে তাহার সহিত মিলাইয়া দূরদেশ ও দূর কালের কবির রচিত এই শ্লোকগুলি যখন আবার পড়িলাম, তখন মনে ইহাই হইল যে, এই কবিতায় যে দিব্যপ্রেরণা রহিয়াছে তাহা বেদমন্ত্রের মতই অপৌরুষেয়; ইহাতে দেশ বা কালের খণ্ডদৃষ্টি নাই—যাহা সত্য ও চিরন্তন তাহাই ইহাতে ছন্দোময় হইয়া উঠিয়াছে।

আর একটি এইরূপ পুরুষ-সূক্ত—খুব নিকটে, আমাদের দেশে, আমাদেরই কবির কণ্ঠে উদ্গীত হইয়াছে; কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের। আমরা সে কবিতা যৌবনেও বহুবার পড়িয়াছি—এ কালের পাঠক বোধ হয় আর পড়ে না, কারণ সে কবিতায় আধুনিক ভঙ্গি নাই; বহুবার পড়িয়াছি বলিয়াই ভুলি নাই, তাই আজ এই ঘটনার পর সে কবিতার স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া চমকিত হইয়াছি। একদিন যাহা ছিল একটি উৎকৃষ্ট কবিতা মাত্র, আজ তাহাই যেন ভারত-ভাগ্যবিধাতার কণ্ঠোচ্চারিত এক দিব্যবাণী, বা দৈববাণী! রাম জন্মিবার আগেই যেমন বাল্মীকির

মনোভূমিতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, এখানেও তেমনই এক বাঙালী কবির চিত্তে তখনও অনাগত এক আদর্শ বীর-নেতার জন্ম হইয়াছিল। সেই আসন্নপ্রায় আবির্ভাবকে কবি যেন কোন দিব্যদৃষ্টির বলে তখনই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন! সমগ্র জাতির মুক্তি-পিপাসা কবির অন্তরতম চেতনাকে অধিকার করিয়া একটি আকুল কামনার রূপ ধারণ করিয়াছিল—সেই কামনাই যেন একটি পুরুষ-মূর্ত্তি গড়িয়া লইয়া তাহাতেই বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেই ভাবমূর্ত্তি যে এমন শরীরী হইয়া উঠিবে, কবিও কি তাহা জানিতেন? ইহাকেই বলে আর্ষ প্রেরণা, তাই আজ যখন এই পুরুষ-সূক্ত পাঠ করি এবং সেই পুরুষকেই বলিতে শুনি—

তুরঙ্গমসম অন্ধ নিয়তি—
বন্ধন করি' তায়
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন-বিপদ লঙ্ঘন করে'
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়।

শতবার করি' মৃত্যু ডিঙায়ে
পড়ি জীবনের পারে;
প্রান্তগগনে তারা অনিমিখ
নিশীথ-তিমিরে দেখাইছে দিক,
লোকের প্রবাহ ফেনায়ে ফেনায়ে
গরজিছে দুই ধারে!

আয়, আয়, আয়—ডাকিতেছি সবে
আসিতেছে সব ছুটে।
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার,
সুখ-সম্পদ মায়া মমতার
বন্ধন যায় টুটে!

যত আগে চলি বেড়ে যায় লোক,
ভরে' যায় ঘাট বাট,
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান-অপমান—
ব্রাহ্মণ আর জাঠ!

যখন সেই নেতার মুখে ঠিক এই কথাই শুনি, তখন স্তম্ভিত হইয়া যাই; কবির কণ্ঠে সেদিন এ কোন্ সরস্বতী ভর করিয়াছিল—এ যে একেবারে প্রতি অক্ষরে সত্য! শুধুই কি তাই? সেই পুরুষের—সেই 'নেতার'—সাধন-জীবনের ইতিহাস, তাহার অন্তরের জপমন্ত্রটিও কবি ধরিয়া দিয়াছেন—

এমনই কেটেছে দ্বাদশ বরষ,
আরও কতদিন হবে—
চারিদিক হ'তে অমর-জীবন
বিন্দু বিন্দু করি' আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে!

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
পেয়েছি আমার শেষ ;
তোমরা সকলে এস মোর পিছে,
নেতা* তোমাদের সবারে ডাকিছে—
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ !

নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগু-পিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাই তার কাছে জীবন-মরণ
নাই নাই আর কিছু !

হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মত—
উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে,
ওই চেয়ে দেখ কতদূর হ'তে
তোমার কাছেতে ধরা দিবে বলে'
আসে লোক শত শত ! †

---

* মূল কবিতায় 'নেতা'র স্থলে 'গুরু' আছে।

† পরে জানিয়াছি, এই কবিতাটি সুভাষচন্দ্রের অতিশয় প্রিয় ছিল, তাঁহার পত্রাদিতে ইহার একাধিক উল্লেখ আছে। 'তরুণের স্বপ্ন' নামক পুস্তকের একস্থানে তিনি ইহার কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—'কবিরা অন্তর্যামী তাই অপরের প্রাণের কথা

তাই বলিয়াছি, এ কবিতা পড়িয়া মনে হয়, সারা ভারতবর্ষ আজ যাঁহার নেতৃত্ব-গৌরবে গৌরবান্বিত—সেই আদর্শ বীর-নেতার জন্ম যেমন বাঙলার মাটিতেই হইয়াছে, তেমনই এ যুগের বাঙলার যিনি শ্রেষ্ঠ কবি তাঁহার চিত্ত-ভূমিতেই সেই আত্মা অনেক পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল! মহাপুরুষগণের আগমন-বার্ত্তা কবি-ঋষির চিত্তে যে আগেই পৌঁছায় তাহার অনেক গল্প আমরা প্রাচীন শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু একালে এরূপ অলৌকিক কাহিনী কেহ বিশ্বাস করে না। ইংরেজ কবির যে কবিতাটি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা যদি কোন অর্থে লৌকিক হয়, রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা সত্যই অলৌকিক; এখানে তিনি যাহার কথা বলিতেছেন, সে যে আর কেহ নয়—প্রতি ছত্রে তাহার প্রমাণ আছে, পাঠক-পাঠিকাগণকে আমি মিলাইয়া দেখিতে বলি; সুভাষচন্দ্রের সারা জীবনের সাধনা, তাঁহার বিভিন্ন সময়ের উক্তিসমূহ এবং তাঁহার সর্ব্বশেষ কীর্ত্তি—এককথায় তাঁহার অন্তর ও বহির্জীবনের পূর্ণ প্রতিকৃতি—এই একটি কবিতার মধ্যে অভ্রান্ত রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়—কবি ও কর্ম্মবীর দুজনেরই জন্মস্থান এই বঙ্গভূমি।

কিন্তু ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এবার এই বাংলাদেশেই ভারতের আত্মা নূতন রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সমগ্র

তাঁহারা এমন করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন'। সুভাষচন্দ্র তখনও 'স্বপ্ন' দেখিতেছিলেন, তাই কবির স্বপ্ন ও তাঁহার নিজের স্বপ্নে এই মিল দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করেন নাই—তখনও তিনি জানিতেন না যে, ঐ কবিতা স্বপ্ন নহে, তাঁহারই জীবনচরিত।

ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া তাহার আয়োজন চলিয়াছিল— আজিকার বাঙালী সেকথা ভুলিয়াছে ; "বাংলার নবযুগ" নামক গ্রন্থে আমি সে কাহিনী সবিস্তারে বলিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতীয়তা-মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে একটা বিশিষ্ট সমাজ ও বিশিষ্ট আদর্শকে সম্মুখে রাখিলেও, তাঁহার দৃষ্টি ছিল সার্ব্বভৌমিক ভারতীয় দৃষ্টি—নবযুগের এই নব-ধর্ম্মের আদি প্রচারক তিনিই। এই জাতীয়তা-ধর্ম্ম স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যান-দৃষ্টিতে আরও বিশুদ্ধ ও গভীর হইয়া উঠে—জাতির হৃদয়ে তিনিই প্রকৃত 'মহাভারতে'র বীজ বপন করেন। তারপর রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কবিজীবনে ভারতীয় ভাব-সাধনার অত্যুচ্চ শিখর কখনও ত্যাগ করেন নাই, বাঙালী হইয়াও তিনি খাঁটি ভারতীয় কবি—ভারতের আদর্শই তাঁহার বাঙালীত্বকে তৃপ্ত করিয়াছে। তাই আজ সেই যুগব্যাপী সাধনার ফলস্বরূপ আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহার মূল যে এই বাংলার মাটিতেই নিহিত থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ; এবং একজনের কল্পনায় ও অপরের জীবনে উহা যে একই রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বাঙালী ভুল করে নাই—তাহার সেই সাধনা মিথ্যা নহে। তথাপি, বাস্তবে ও কল্পনায় এই যে সাদৃশ্য ইহার কারণ আরও গভীর—প্রবন্ধের ভূমিকায় আমি সেই কথাই বলিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি ('গুরুগোবিন্দ'—মানসী) রচনা করিয়াছিলেন—ভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এক বীরের জীবনকে

উপলক্ষ্য করিয়া, সুইনবার্ণ যেমন করিয়াছিলেন—আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে তাঁহার কবি-হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করিবার জন্য। উভয় কবিতার মধ্যেই মানবাত্মার অপরাজেয় শক্তি ও মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইতিহাসের এক একটি পুণ্যক্ষণে যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে—যে যজ্ঞে সেই এক বিরাট-পুরুষ আপনাকে আহুতি দেন, যাহার হবির্গন্ধে ও মন্ত্রচ্ছন্দে যজমান আমরা সেই মহাপ্রাণের সঙ্গে আমাদের প্রাণ যুক্ত করিয়া অমৃতত্ব-লোভে অধীর হই—উভয় কবি সেই একই যজ্ঞের পুরুষ-সূক্ত রচনা করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, ইংরেজ কবি এই যজ্ঞের গূঢ় তাৎপর্য্য যেরূপ বুঝিয়াছেন তাহাতে ঐ আত্মাহুতি, ঐ মৃত্যুই অমৃতের সোপান—উহাই আত্মার পরম ধর্ম্ম; তিনি মৃত্যুকেই মহিমান্বিত করিয়াছেন, তাহাতে পুরুষ-যজ্ঞের একদিক অতিশয় যথার্থরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে সূক্তটি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে মৃত্যু অপেক্ষা জীবনের কথাটাই বড় হইয়াছে—সেই পুরুষ আপনার বিরাট প্রাণ ক্ষুদ্রের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করে, চারিদিকে মহাজীবনের সাড়া পড়িয়া যায়। এখানে মৃত্যুর চিন্তাই যেন নাই, একের তপস্যায় আর সকলের সর্ব্বভয়, সর্ব্ববন্ধন ঘুচিবে—প্রবৃদ্ধ জীবন-চেতনায় মৃত্যুর সংস্কার পর্য্যন্ত তিরোহিত হইবে। এ পুরুষের মুখে কেবল ইহাই শুনি—"আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে সকল দেশ!" অতএব মূলে দুইটি এক হইলেও, রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তে যাহার ছায়া

পূর্ব্বগামিনী হইয়া দেখা দিয়াছিল, আজ তাহারই ঐ জীবন্ত রূপ
দেখিয়া মনে হয়—কোন ঊর্দ্ধলোকে আত্মার অমরত্বলাভই
পরম-পুরুষার্থ নয়, এই জীবনেই মৃত্যুকে জয় করিতে হইবে
বেদোক্ত বিরাট পুরুষ যেমন আত্মোৎসর্গের দ্বারা, অর্থাৎ
তাহার অসীমাকে সীমাবদ্ধ করিয়া, এই সৃষ্টির ধারাকে প্রবাহিত
ও প্রাণবন্ত করিয়াছে, তেমনই আজিকার এই নব পুরুষ-সূক্তে
সেই পুরুষের পুণ্য-অবদান কীর্ত্তন করিবে—"যাহার জীবনে
লভিয়া জীবন জাগিবে সকল দেশ"।

পৌষ, ১৩৫২

স্বামীজী ও নেতাজী

"If there were another Vivekananda he would have understood what Vivekananda has done. And yet—how many Vivekanandas shall be born in time."

—স্বামী বিবেকানন্দ

১

এই বাংলাদেশে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহার মত সন্ন্যাসী অথচ দেশ-প্রেমিক ভারতবর্ষে পূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই। এই মহাপুরুষ—বিবেকানন্দ। তিনি পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং দেশে দেশে তাঁহার গুরুর নব জীব-ব্রহ্মবাদ প্রচার করিয়াছিলেন; এক নব বেদান্তধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া দেশ-বিদেশে তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল। তিনি জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসী হইয়াও এক নূতন কর্ম্মমন্ত্রের সাধক ছিলেন, এবং বহুকাল পরে এই ভারতবর্ষে বুদ্ধের আদর্শে এক সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহা সকলেই জানে, কিন্তু তাঁহার সেই কর্ম্ম-জীবনের মূলে অধ্যাত্ম-পিপাসাকেও পরাভূত করিয়া কোন্ মানব-হৃদয়-বেদনা অনুক্ষণ জাগরূক ছিল, তাহা সেকালে কেহ বুঝিয়াও বুঝিতে পারে নাই; আজ আর একজনকে দেখিয়া আমরা তাহা বুঝিয়াছি—বিবেকানন্দ-জীবনের জীবন্ত ভাষ্যরূপে আজ আমরা নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে দেখিতেছি। আগে স্বামীজীর কথাই

বলি। স্বামীজীকে না বুঝিলে নেতাজীকে বুঝা যাইবে না; আবার নেতাজীকে না দেখিলে স্বামীজীর দর্শনলাভ হইবে না।

আমি বলিয়াছি, সে যুগে স্বামীজীর জীবনের সেই অপর দিক তাঁহার সেই মহান্ হৃদয়ের অতি-নিরুদ্ধ বেদনা কেহ বুঝে নাই, তাঁহার সে পরিচয় কেহ ভাল করিয়া পায় নাই। তাহার কারণ, তাঁহার যুগ তখনও আগামী—আসে নাই। কেবল একজন—যিনি গুরুর হৃদয় আপন হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন—সেই পরম সৌভাগ্যবতী গুরুগতপ্রাণা, স্বামীজীর মানস-কন্যা ভগিনী নিবেদিতা তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহারই মুখে আমরা সে কথা শুনিয়াছি; তিনিই বলিয়াছিলেন—

"বাগুরাবদ্ধ সিংহের মত—মুক্তিলাভের জন্য তাঁহার সেই দুরন্ত প্রয়াস এবং নিরুপায় নিষ্ফলতার সেই যে নিদারুণ যন্ত্রণা—ইহাই ছিল আমার গুরুদেবের ব্যক্তি-চরিত্রের বিশিষ্ট পরিচয়। যে দিন জাহাজঘাটে অবতরণ করিয়া আমি তাঁহাকে এ দেশের মাটিতে প্রথম দেখিয়াছিলাম, সেই প্রথম দেখার দিন হইতে—যে আর একদিন গোধূলি সন্ধ্যায় তিনি তাঁহার দেহটাকে ভাঁজ-করা বসনের মত ত্যাগ করিয়া, এই জগৎ-পল্লীবাস হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন—সেই দিন পর্য্যন্ত, আমি সর্ব্বদা অনুভব করিতাম যে, তাঁহার জীবনে অপর একটির মত এইটিও ওতপ্রোত হইয়াছিল।"

ইহাই যে বিবেকানন্দ-জীবনের মূলতত্ত্ব তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি নাই। ইহার পূর্ব্বে আর একজনের মধ্যে, আর

একরূপে ও আর এক মাত্রায় এই বেদনা জাগিয়াছিল, তাঁহার সেই বেদনাও কেহ বুঝে নাই। তিনি ছিলেন কবি, সেই বেদনাকে তিনি তাঁহার হৃদয়স্রুত শোণিতধারায় লেখনীমুখে মুক্তি দিয়াছিলেন। বাঙালী তাহার রস আস্বাদন করিয়াছিল—সে বেদনা বুঝে নাই। আমি বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলিতেছি; বঙ্কিমচন্দ্র ধূঁয়ার ছলনা করিয়া কাঁদিয়াছিলেন, সে-কান্না তখন কেহ বিশ্বাস করে নাই। স্বামীজীর বেদনা আরও গভীর, আরও বাস্তব; তাহার কারণ, তাঁহার দৃষ্টি, ঊর্দ্ধেও যতদূর—নিম্নেও ততদূর প্রসারিত ছিল; তিনি মানবাত্মার মুক্তিকেও যেমন, তাহার বন্ধনকেও তেমনি আত্মগোচর করিয়াছিলেন। এজন্য সেই বন্ধন তাঁহার যেমন অসহ্য হইয়াছিল এমন আর কাহারও হয় নাই। কোন্ দেশের কোন্ সমাজে তিনি মানুষের চরম দুর্গতিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন? পৃথিবীর আর সকল দেশে তিনি মানবাত্মার মহিমা ঘোষণা করিতেন, কিন্তু নিজের দেশে আসিয়া তিনি নির্ব্বাক হইয়া যাইতেন, অশ্রুবাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইত। যেন ভারতের অভিশপ্ত দেহে ভারতেরই সেই গর্ব্বোদ্ধত আত্মা—সেই "বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্"—আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিত, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী-ভারত যোগাসনে স্থির থাকিতে পারিত না! কিন্তু স্বামীজির সে যাতনা রোদনরবে উচ্ছ্বসিত হয় নাই; সেই অশ্রুকেও নিরুদ্ধ করিয়া, সেই বিষকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এই মৃতকল্প জাতির শিয়রে জাগিয়া রহিলেন, এবং তাহার বক্ষে ও বাহুতে বলাধান করিবার জন্য, কর্ণে

ক্রমাগত 'শিবোঽহম্' 'শিবোঽহম্' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ব্যাধির নিদান তিনি ভালরূপই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু অবস্থ বুঝিয়া তিনি তখনই কোন উগ্র ঔষধের ব্যবস্থা করেন নাই একবার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়াটা স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে পারিলে সকল উপসর্গ অন্তর্হিত হইবে, এখন তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি করিলে সকলই পণ্ড হইবে; এ রোগের চিকিৎসায় বড় ধৈর্য্যে প্রয়োজন; প্রাথমিক চিকিৎসাটাই আসল, সেইটি যদি ধরিয় যায় তবে আর কোন ভাবনা নাই—রোগীর চেতনা হইবে, সে আপনি উঠিয়া বসিবে; তখন সকল দুর্ব্বলতা ও উপসর্গ আবশ্যকমত অঙ্গচালনার দ্বারা নিজেই দূর করিতে পারিবে ইহাই ছিল তাঁহার আত্মগত বিশ্বাস। ভগিনী নিবেদিতা তাহাই বলিয়াছেন—

"He felt that impatience was inexcusable. If in twelve years any result were visible, this fact would constitute a great success. The task was one that might well take seventy years to accomplish."

স্বামী বিবেকানন্দ স্বজাতির সেই ব্যাধিযন্ত্রণাও যেমন, তাহা হৃত-স্বাস্থ্যকেও তেমনি, নিজ দেহে ও আত্মায় যেরূপ অনুভ করিয়াছিলেন, এ যুগে তৎপূর্ব্বে আর কেহ তেমন করে নাই— এই সত্য সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। তাহা কারণও ছিল। প্রথমতঃ তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী; সর্ব্বত্যাগ সন্ন্যাসীর যে প্রেম তাহার কি নাম দিব? ভারতবর্ষে প্রেমকে ভগবৎ-প্রেমের সর্ব্বোচ্চ আদর্শে শোধন করিয়া মানুষে

মুক্তি-সাধনার অনুকূল করা হইয়াছে; কিন্তু সেই ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনাকে তুচ্ছ করিয়া এই যে মানব-প্রেম, এবং বিশেষ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম, ভারতবর্ষে ইহা নূতন; আবার এই প্রেমও যে অধ্যাত্ম-পিপাসারই একটা রূপ, তাহা একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভব। সন্ন্যাসী না হইলে, বৈরাগ্যের দ্বারা সুরক্ষিত না হইলে, প্রেম এমন নির্ভীক ও বলীয়ান হইতে পারে না, প্রাণ এমন মুক্ত ও স্বাধীন হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সেই কারণেই কোন সমাজ-বন্ধন না থাকায়, তিনি দেশের সকল সমাজে মিশিয়া, সকলপ্রকার জীবন-যাত্রা আপন চক্ষে দেখিবার ও আপন বক্ষে বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। দেশকে ভালবাসার মূলে ছিল—দেশের যাতনাক্লিষ্ট সর্ব্ব-অঙ্গের এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ঐ পরিচয়ের কাহিনী মহাকাব্য অপেক্ষাও রোমাঞ্চকর; এখানে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একদা, প্রায় দুই বৎসর তিনি সমগ্র ভারত পর্য্যটন করিয়াছিলেন—ইহা সেই সময়ের কথা। তাঁহার জীবনবৃত্তকার লিখিয়াছেন—

"সকল মানুষের সঙ্গে তিনি সমপদস্থের ন্যায় ব্যবহার করিতেন—ছোট-বড়-ভেদ ছিল না। অস্পৃশ্য পারিয়ার গৃহেও তিনি যেমন দরিদ্র-ভিক্ষুকের বেশে আশ্রয় লইতেন, তেমনি রাজা-জমিদারদিগের প্রাসাদে তাঁহাদের সমকক্ষ-রূপে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন; গরীব-দুঃখীর ঘরে, কোথাও গোয়ালের মাচায়, কোথাও বা মাটিতে ছেঁড়া চাটাই-এর উপরে একত্র শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতেন—সমাজে যাহারা পতিত ও

উৎপীড়িত তাহাদের দুঃখ ও অপমান তিনি নিজেরই দুঃখ ও অপমা বলিয়া মনে করিতেন। মধ্যভারতে ভ্রমণ কালে তিনি একদা এ মেথর-পরিবারে কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন। এইরূপ অতি-নিম্নশ্রেণী মানুষের মধ্যেও—যাহারা সমাজের ভয়ে এমন ভীত ও সঙ্কুচিত—তাহাদে মধ্যেও, আত্মার অপূর্ব্ব শুচিতা দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন—সঙ্গে সং তাহাদের সেই দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার যেন শ্বাসরোধ হইত।"

ঐ যে দুর্গত, আত্মভ্রষ্ট, মহাদুঃখী ভারতের জনসাধারণ উহাদের মধ্যেই তিনি মানব-মহত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন—জীবের ভিতরে শিবকে দেখিয়াছিলেন। ইহাই দেখিবার জন্য তিনি পরিব্রাজকবেশে ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছিলেন হিন্দু-মুসলমান, শূদ্র ও অন্ত্যজ, গৃহী ও সন্ন্যাসী, পণ্ডিত-মূর্খ পতিত ও পুণ্যবান, সকলের মধ্যে তিনি সেই এক ভারতীয় ভাবের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া একটা বড় আশায় আশান্বি হইয়াছিলেন। একদা এক রাজার সভায় এক নর্ত্তকীর গান শুনিয়া তিনি যেন নিজেও তাহার দ্বারা ভৎর্সিত হইয়াছিলেন মানুষ যে কোন অবস্থাতেই আত্মার শুচিতা হারায় না, সকল মানুষই যে শ্রদ্ধার যোগ্য, এ বিশ্বাস সত্ত্বেও একবার তিনি ঠকিয়াছিলেন—রাজপ্রাসাদে বাইজীর গান শুনিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। বাইজী তাহা বুঝিতে পারিয়া সাধক-কবি সুরদাসের একটি গান এমন তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিল যে, স্বামীজী একেবারে অভিভূত হইয়া গেলেন। সেই পতিতা নারী গাহিতেছিল—

"ওগো নাথ, ওগো প্রভু! তুমিও আমার কলঙ্কের দিকটাই দেখিও না! তোমার চক্ষে যে সব সমান! যে-লৌহ দেবমন্দিরে বিগ্রহের দেহে স্থান পায় মাংসবিক্রেতা কসাইয়ের ছুরিতেও যে তাহাই রহিয়াছে! কিন্তু পরশমণির স্পর্শে দুই-ই ত' সোনা হইয়া যায়! তবে কেন তুমি আমার পাপটাই দেখিতেছ? হে নাথ! হে প্রভু! তোমার চক্ষে যে সব সমান!"

"একই বৃষ্টিবিন্দু যমুনার জলে বা পথিপার্শ্বের অপবিত্র পয়ঃপ্রণালীতে পড়ে, কিন্তু সেই জল গঙ্গায় মিশিলে উভয়ই সমান পবিত্র হইয়া যায়। ওগো নাথ! ওগো প্রভু! তুমি আমার কলঙ্কটাই দেখিও না—তোমার চক্ষে যে সব সমান!"

বাইজীর মুখে ঐ সুরে ঐ গান শুনিয়া স্বামীজীর মনে কি হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। আর কোন্ দেশে ঐ শ্রেণীর নারীর মুখে মুহূর্তের জন্যও এমন দিব্যভাব ফুটিয়া উঠে? এমন সহজলব্ধ ভাবাবেশ জাতির বহুকালাগত সাধনার পরিচায়ক নহে কি? স্বামীজীর মত মহাভাবের ভাবুক, অতি-উচ্চ অধ্যাত্ম-পন্থী সাধককেও এই দেশ ও এই জাতি কেন যে এত মুগ্ধ করিয়াছিল—তাহার বর্তমান দুর্দ্দশা তাঁহাকে কেন যে এমন অভিভূত করিয়াছিল, আমি সংক্ষেপে তাহার একটু আভাষ দিলাম।

একদিকে এই ভারত—ভারতের হীনতম দীনতম নরনারীর মধ্যে প্রাণ ও প্রতিভার ঐ ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি, এবং সে সম্বন্ধে সকল সংশয়ের তিরোধান; অপরদিকে সেকালের একমাত্র ভরসা—সেই নবযুগের নবভাবোন্মুখ শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়; একটি

হইল ক্ষেত্র, আর একটি হইল কর্ষণ-যন্ত্র, এবং মন্ত্র হইল জীব-শিববাদ। ইহাই হইল স্বামীজীর কর্ম্মপন্থা ; অতঃপর তিনি ঐ যুবকদল হইতেই—জাতির উদ্ধারকল্পে—ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত একটি সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গড়িয়া লইতে মনস্থ করিলেন।

২

স্বামীজীর দেশ-প্রেমের কথা বলিয়াছি, সেই প্রেমের মূল কোথায় তাহাও বলিয়াছি। এক্ষণে, তাঁহার সেই আদর্শ বা নীতি যে ভ্রান্ত নয়, এবং তাহাই যে আপন নিয়মেই যথাকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে পূর্ণ ও নিঃসংশয়রূপে প্রকাশমান হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে স্বামীজীর সেই মন্ত্রটিকে আর একটু ভাল করিয়া অবধারণ করিতে হইবে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে পতিত-আত্মার উদ্ধার নানা উপায়ে হওয়ার বিধি ও উপদেশ আছে—ভক্তিশাস্ত্রে তাহা একরূপ, শক্তিশাস্ত্রে তাহা অন্যরূপ। শেষে পৌরাণিক ভাগবত ধর্ম্মই প্রবল ও লোকায়ত হইয়া উঠিয়াছিল; উহা মূলে ভক্তিমার্গ; ভগবানে আত্মসমর্পণ, আত্মার দৈন্য বা পাপ-স্বীকারই উহার মুক্তিতত্ত্ব। স্বামীজী প্রথম হইতেই ইহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন না, তাঁহার অধ্যাত্ম-পিপাসা ও অন্তর-প্রকৃতি ছিল ইহার বিপরীত। পরে, দেশের ঐ দারুণ দুরবস্থা-দর্শনে, তাঁহার সেই স্বকীয় অধ্যাত্ম-দৃষ্টিই আরও নিঃসংশয় হইয়া উঠিল; জাতির উদ্ধারকল্পে, ভক্তি নয়—শক্তিকেই তিনি একমাত্র সাধন-পন্থা বলিয়া দৃঢ়-নিশ্চয় করিলেন। তত্ত্ব বা সাধন-মার্গ হিসাবে ভক্তির মূল্য যেমনই হৌক, উহা যে এ যুগের ঐ সঙ্কটে শুধুই নিরর্থক নয়—বরং ক্ষতিকর, এবং শক্তিই যে একমাত্র সত্য-মন্ত্র, তাহা তিনি যে-দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধি করিয়া-

ছিলেন, এবং যে ভাবে ও যে রূপে সেই আধ্যাত্মিক শক্তিবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার প্রতিভারই নিদর্শন। তিনি যে শক্তিমন্ত্রের সাধক ও প্রচারক ছিলেন তাহাতে আত্মার জাগরণ আগে, পরে আর সব। তিনি পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিতেন যে, 'man-making' বা মানুষ-গড়াই তাঁহার একমাত্র কাজ; তিনি আর কিছুই করিবেন না,—অন্ততঃ সেইকালে আর কিছু করিবার প্রয়োজনই নাই। এই মন্ত্রও তিনি পাইয়াছিলেন উপনিষৎ হইতে; তিনি বলিয়াছেন **"I have never quoted anything but the Upanishads, and of the Upanishads it is that one idea, *Strength*"**। উপনিষৎ বটে; কিন্তু তাহা হইতে ঐ মন্ত্রটি এমন করিয়া আর কে উদ্ধার করিয়াছিল? এই বাংলাদেশে উপনিষৎ লইয়া, তাহার সেই ব্রহ্মবাদ লইয়া, কত গর্ব্ব কত অভিমানই স্থুরু হইয়াছিল—সেই অতি দুর্ব্বল ও সংকীর্ণ মনোভাব, প্রেমকে আত্ম-প্রেম এবং শক্তিকে একরূপ মানসিক লীলা-বিলাসে পরিণত করিয়াছিল। স্বামীজীর সেই মন্ত্রও ঐ এক উপনিষদের মন্ত্র বটে, কিন্তু মন্ত্র যদি উপযুক্ত আধার না পায় তবে মন্ত্রও জড় প্রাণহীন শব্দসমষ্টি মাত্র মানুষকে আশ্রয় করিয়াই মৃত মন্ত্র সঞ্জীবিত হয়। স্বামীজী নিজে সেই আধার হইয়া মন্ত্রের নির্ব্বাণ-বহ্নিকে সন্ধুক্ষিত করিয়াছিলেন; উপনিষৎ নয়, বেদান্ত নয়, কোন পুঁথির শ্লোক নয়—সেই মন্ত্র তাঁহারই নিজ-শক্তির বাঙ্ময় মূর্ত্তি। সেই সত্যকে তিনিই অপরোক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের সেই প্রতীতিই সেই মন্ত্রকে

এমন শক্তিশালী করিয়াছিল। তিনি যখন বলিলেন—"তোমরা কহই ক্ষুদ্র নও; ঐ কু-সংস্কার, ঐ-কুবিশ্বাসই সকল ভয় ও সকল দৌর্ব্বল্যের কারণ; Man has never *lost* his empire. The soul has never been bound. Believe that you are free, and you will be"—তখন সেই বাণী বাণীহিসাবে নূতন নহে, অতি পুরাতন; কিন্তু তাহার সহিত বক্তার নিজেরই যে অসীম বিশ্বাস যুক্ত ছিল—"আমি বলিতেছি, ইহার মত সত্য আর কিছু নাই"—"সেই Verily I say unto you"—তাহাই সেই বাণীর মন্ত্রশক্তি। তখন সে শুধুই কথামাত্র নয়; তাহা যুক্তি-তর্ক-প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, একেবারে সোজা প্রাণের গভীরে প্রবেশ করে—দীপ হইতে দীপের মত, শক্তির স্পর্শে শক্তির উদ্বোধন হয়। স্বামীজী শুধু ইহাই করিয়াছিলেন, আর কিছুই করিতে চাহেন নাই—নিজ আত্মার সকল শক্তি দিয়া তিনি নব্যভারতের কানে এই মন্ত্রটি মাত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রই বটে! কারণ ইহার ত শুধুই অর্থ নয়—একটা অদ্ভুত চেতন-শক্তি—চমকিত করে; বুদ্ধি নয়—একরূপ বোধির উদ্রেক করে! স্বামীজীর সেই বাণী একই; যত ভঙ্গিতেই উচ্চারিত হউক তাহার অন্তর্গত সত্য যে এক, কিছুতেই তাহা হইতে যে নিষ্কৃতি নাই—ইহাও সেই সত্যেরই একটা বড় প্রমাণ। আমি এখানে কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—"He who does not believe in himself is an atheist" (যাহার আত্ম-বিশ্বাস নাই সে-ই প্রকৃত

নাস্তিক); "Believe first in yourself, then in God" (আগে নিজেকে বিশ্বাস কর, পরে ভগবানে বিশ্বাস করিও); "The history of the world is the history of a few men who had faith in themselves" (পৃথিবীর ইতিহাস বলিতে অল্প কয়েকজন মানুষের কাহিনীই বুঝায়—ইহাদের অসীম আত্ম-প্রত্যয় ছিল)।

এই বাণীর অর্থ তখন কি সকলে সম্যক বুঝিয়াছিল? হয় ত' অনেকে পরোক্ষ করিয়াছিল, কিন্তু অপরোক্ষ করিয়াছিল কয়জন? সাধারণে বিশ্বাস করিবার কথা ইহা নয়—বিশ্বাস করিবার প্রয়োজনও নাই; কারণ, "The history of the world is the history of a few men" এক একটা যুগে এক একটা মানুষই জাগে; সেই একের পূর্ণ-জাগরণে আর সকলের যেটুকু জাগরণ ঘটে তাহাতেই যুগ-প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। আজ আবার সেই 'একজন'ই জাগিয়াছে—উপরের ঐ বাণীকে আমরা তাহারই রূপে মূর্ত্তি ধরিতে দেখিয়াছি! বিবেকানন্দের ঐ বাণী যেন এই আবির্ভাবের আবাহন-মন্ত্র—"আবিরাবির্ম এধি!" সেই বাণীই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নেতাজীরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। এইবার সেই কথাই বলিব, তথাপি স্বামীজী হইতে নেতাজীতে পৌঁছিতে হইলে, আরও দুই একটি কথা বলিয়া রাখিলে ভাল হয়।

বিবেকানন্দের দেশ-প্রেম যে একটা আধ্যাত্মিক কিছু ছিল, তিনি যে দেশকে ভালবাসিয়া কেবল তাহার আত্মার মোক্ষ বা

মুক্তির উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার ঐ নব-গঠিত সন্ন্যাসীর দলও যেমন বিশ্বাস করিত না, তেমনই, তাঁহার সেই বাণী সেকালের তরুণদের প্রাণে কোন্ ভাবের উদ্দীপনা করিয়াছিল তাহার প্রমাণ বাংলার আধুনিক ইতিহাসের এক অধ্যায়ে চির-উজ্জ্বল হইয়া আছে। তথাপি স্বামীজীর এই প্রেম, এবং তজ্জনিত সেই যাতনার সম্বন্ধে পুনরায় দুইজনের দুইটি উক্তি স্মরণ করাইতেছি ; একজনের উক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর একজন (মঃ রোলাঁ) বলিয়াছেন—

"মাতৃভূমি ভারতের সেই সর্ব্বাঙ্গ-নগ্ন মূর্ত্তি—তাহার যত কিছু শোচনীয়তা—তাঁহার আর অজ্ঞাত রহিল না ; অতিশয় হীন শয্যায় শায়িত সর্ব্বাভরণরিক্ত সেই রাজেন্দ্রাণীর দেহ তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছিলেন।"

ভগিনী নিবেদিতার আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"কিন্তু তিনি ছিলেন আজন্ম-প্রেমিক—প্রেম ছিল তাঁহার জন্মগত সংস্কার ; সেই প্রেম-পূজার দেবী ছিল তাঁহার মাতৃভূমি। তাহার কোন দোষ যে তিনি ক্ষমা করিতে পারিতেন না—তাহার সংসার বৈরাগ্যকেও একটা গুরুতর অপরাধ বলিয়াই গণ্য করিতেন—তাহার কারণ, তিনি তাঁহার (স্বজাতির) সেই সকল দোষকে তাঁহার নিজের দোষরূপেই দেখিতেন।"

মাতৃভূমির এই যে দুর্দ্দশা—ইহার প্রত্যক্ষ বাস্তব কারণ কি, তাহা কি তিনি জানিতেন না ? সে কি তাঁহার সেই অসাধারণ জ্ঞান ও প্রেমের অগোচর ছিল ? কিন্তু তাঁহার সেই দৃষ্টি অতিশয় ধীর ও গভীর ছিল বলিয়াই তিনি সেই বাস্তব কারণটির

উচ্ছেদ-চিন্তা তখন স্থগিত রাখিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তথাপি আমি তাঁহার সেই অন্তর-নিরুদ্ধ দহন-জ্বালা, এবং একদা সেই জ্বালা তাঁহারও কিরূপ অসহ্য হইয়াছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ একটি কাহিনী উদ্ধৃত করিব। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার গুরুর সহিত হিমালয়ভ্রমণ-কালে, একটি ঘটনায় স্বামীজীর অন্তরে হঠাৎ যে অগ্ন্যুৎপাত দেখিয়াছিলেন, তাহার গভীরতর কারণ তিনিও চিন্তা করেন নাই—কেবল, সেই ঘটনার ফলে তাঁহার গুরুর অধ্যাত্ম-জীবনে কিরূপ বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল, তাহাই বলিয়াছেন। ঘটনাটি এই। স্বামীজীর বড় ইচ্ছা ছিল কাশ্মীর রাজ্যে একটি মঠ ও একটি সংস্কৃত-বিদ্যালয় স্থাপন করেন; মহারাজার নিকট হইতে একটু জমি যে তিনি পাইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না, রাজম তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু এই সামান্য বিষয়েও, তৎকালীন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট **Sir Adalbert Talbot** বিরুদ্ধতাচরণ করিলেন, মহারাজার সম্মতিও তুচ্ছ হইয়া গেল এই ঘটনায় স্বামীজী দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন, সে আঘাত যে কিসের আঘাত, তাহা বোধ হয় আজ আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন, ইহার পর কয়েক সপ্তাহ স্বামীজীর ভিতরে এক তুমুল ঝড় বহিয়াছিল, সেই অবস্থায় তিনি ইংরেজীতে যে 'কালী-স্তোত্র' লিখিয়াছিলেন, তাহা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। এই স্তোত্রের শেষ কয় পংক্তি এইরূপ—

"এসো মহাকালী! প্রলয়ঙ্করী এসো মা!
যে জন ডরে না দুঃখেরে ভালবাসিতে,
নাচিতে যে পারে সর্ব্ব জগৎ নাশিতে,
মৃত্যুরে ধরি' খায় তার মুখে চুমা,—
তারি কাছে আসে সর্ব্বনাশিনী মা!"

বোধ হয় এই সময়েই তিনি বলিয়াছিলেন—

"Worship Death! All else is vain. Yet this is not the coward's love of death; it is the welcome of the strong who has sounded everything to its depths, and knows there is no other alternative."

—এই বাণী কোন্ অবস্থায় কাহার মুখের বাণী? ইহা কি অতিশয় বর্ত্তমানে, সারা ভারতের, তথা বাংলার—আত্মত্রাণের মন্ত্র-বাণী নয়? কিন্তু সে সময়ের সেই দারুণ যন্ত্রণা উপশমের জন্য স্বামীজী যে সান্ত্বনাবাক্য খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, তাহার মত উদাস অথচ করুণ আর কি হইতে পারে? ইহার কয়েকদিন পরে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাকালে কতকগুলি ফুল হাতে লইয়া তিনি আবার দেখা দিলেন (স্বামীজী একখানি পৃথক হাউস-বোটে থাকিতেন; কোথায় কখন যাইতেন তাহাও কেহ জানিত না); কোন কথা না বলিয়া সেই ফুলগুলি সকলের মাথায় স্পর্শ করাইয়া শেষে এই বলিয়া মৌন ভঙ্গ করিলেন—"আমি এই ফুলগুলি মার পায়ে দিয়াছিলাম"। কিছুক্ষণ আর কিছু কহিতে পারিলেন না, আর সকলেও স্তব্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে অতি ধীরে শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "দেশকে ভালবাসা দেশের জন্য সর্ব্বপ্রকার

ভাবনা-চিন্তা—আজ হইতে ত্যাগ করিলাম। এখন হইতে আর কিছু নয়, কেবল—মা! মা! আমি বড় ভুল করিয়াছিলাম, তাই মা আমাকে ভৎ'সনা করিয়া বলিলেন, 'বিধর্ম্মীরা যদি আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, আমার বিগ্রহগুলাকে অপবিত্র করে, তাহাতে তোর কি ? তোর ত' আস্পর্দ্ধা কম নয়! তুই আমার রক্ষাকর্ত্তা, না আমিই সকলকে রক্ষা করি ?"—তাই আর নয়, আমি সব ভাবনা ত্যাগ করিয়াছি। স্বামীজীর কথা বোধ-হয় আর অধিক বলিতে হইবে না; ঐ ঘটনা, এবং ঐ কথাগুলির ভিতরে স্বামীজীর যে পরিচয় অসংশয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পর নেতাজীর আবির্ভাবকে আর অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত বলিয়া মনে হইবে না। স্বামীজী সেদিন যে জ্বালাকে জোর করিয়া রুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই যথাকালে অগ্নিশিখায় বিস্ফুরিত হইয়াছে।

৩

আমি এ পর্য্যন্ত স্বামীজীর কথাই বলিয়াছি—কিন্তু নেতাজীর কথা কই? পাঠকপাঠিকারা বোধ হয় একটু অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আমি ত এতক্ষণ আর একজনের জবানিতে নেতাজীর চরিত-কথাই বুঝাইতেছিলাম—আপনারা কি তাহা বুঝিতে পারেন নাই? যদি না পারিয়া থাকেন তবে নেতাজীকে আপনারা কিরূপ চিনিয়াছেন? নেতাজীর চরিত্রের একটু ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলে আপনারা কি দেখিতে পান? [স্বামীজীর মতই তিনি কি আকুমার ব্রহ্মচারী নহেন? স্বামীজীকে বিদেশীরাও Warrior-saint' আখ্যা দিয়াছে, তাঁহার চরিত্রেও ক্ষত্রিয়-স্বভাবের প্রাধান্য ছিল—ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। স্বামীজীও ঠিক যে কারণে দেশ-প্রেমিক, নেতাজীও কি ঠিক তাহাই নহেন? নেতাজীর দেশ-প্রেমে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে যে এক অপূর্ব্ব "ভারতীয়তা"-বোধ আমরা দেখিয়াছি—দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, স্বামীজীর মধ্যে ঠিক তাহাই ছিল,] বরং ইহাই বলিলে আরও যথার্থ হইবে যে, স্বামীজীর সেই দেশপ্রেম-মন্ত্রই নেতাজীর সাধনায় বাস্তবে পরিণত হইয়াছে; সে মন্ত্র আর কাহারও নয়—স্বামীজীর। ভগিনী নিবেদিতার গ্রন্থে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, [স্বামীজীও মোগল-সাম্রাজ্যের গৌরবকে ভারতের গৌরব বলিয়া মনে করিতেন; শের শাহ, আকবরের নামে তাঁহার বক্ষ যেমন স্ফীত হইত,

মুসলমান সাধু ও সাধকের পুণ্যকাহিনীও তেমনই তাঁহার প্রিয় ছিল। যে ভারতকে স্বামীজী ধ্যানে লাভ করিয়াছিলেন, নেতাজী তাহাকেই মূর্ত্তিতে গড়িয়া তুলিয়াছেন। স্বামীজী ভারতীয় সমাজে নারীকে যে গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন—নেতাজীর মনোভাবও কি তাহাই নয়? স্বামীজী বলিতেন—

"With five hundred men the conquest of India might take fifty years, with as many women not more than a few weeks."

ইহার পর, নেতাজীর "ঝান্সীর রাণী"-বাহিনী স্বামীজীর কীর্ত্তি বলিয়াই মনে হয় না? আমি অবশ্য সেই মনোভাবের কথাই বলিতেছি। আর কত বলিব? নেতাজীর প্রেম, নেতাজীর ত্যাগ, নেতাজীর জ্বলন্ত আত্ম-বিশ্বাস—একদিকে অসুরের মত কর্ম্মশক্তি বা রাজসিক উদ্যমশীলতা, অপরদিকে যোগযুক্তের মত "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ"-আত্মার সেই অবিক্ষুব্ধ প্রশান্তি; একদিকে অতি তীক্ষ্ণ বাস্তব-বোধ ও কার্য্যকুশলতা বা 'দক্ষতা', অপরদিকে কবির মত উচ্ছ্বাসপ্রবণ হৃদয়—এ সকলই দুই চরিত্রের এক লক্ষণ! বোধ হয়, নেতাজীর আকৃতিতেও কোথাও স্বামীজীর সহিত সাদৃশ্য আছে—ঠিক বলিতে পারি না, প্রবীণ রূপদক্ষেরাই তাহা স্থির করিবেন।

কিন্তু নেতাজীর জীবন-চরিত, তাঁহার শৈশব, বাল্য যৌবনের শিক্ষা-দীক্ষা ও কার্য্যকলাপ যাঁহারা অবগত আছেন

তাহারা হয় ত' ইহাও বলিবেন যে, নেতাজীর জীবনে স্বামীজীর প্রভাব অতি অল্প বয়সেই পড়িয়াছিল। এই প্রভাবের কথা আমি মানি, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। স্বামীজী বলিতেন, তিনি বুদ্ধের দ্বারা বড় বেশি আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে, দুই জনই এক-বংশীয়, অর্থাৎ একই জাতের আত্মা। তাই প্রভাব বলিতে শুধুই শিষ্যত্ব বুঝায় না, সমগোত্রতাও বুঝায়। আধার যদি একই শক্তি বা সমান আয়তনের না হয় তবে মন্ত্র এক হইবে কেমন করিয়া? স্বামীজীর ধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিল—"Believe first in yourself then in God"; সেই অদম্য আত্ম-বিশ্বাস নেতাজীর জীবনে যেন প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া উঠিয়াছে! আবার স্বামীজীর সেই বাণী—"Fight always, fight and fight on, though always in defeat—that's the ideal! (কেবল যুদ্ধ, অবিরাম যুদ্ধ! প্রতিবার পরাজয় হইবে জানিয়াও যে যুদ্ধ—তাহাই ত শ্রেষ্ঠ বীর-ধর্ম্ম!)—ইহাও কে এমন করিয়া অন্তরে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছে? স্বামীজীর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিলেন—"তাহার নিজের জ্বলন্ত আত্ম-বিশ্বাসই আর সকলের অবসন্ন চিত্তে নষ্ট-বিশ্বাস ও সাহস ফিরাইয়া আনিবে"—ইহাও যেন নেতাজীর সম্বন্ধে আরও সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

তথাপি দুই চরিত্র কি এক? দুইয়ের মধ্যে কি কোন প্রভেদ নাই? প্রভেদ কিছু না থাকিয়া পারে না, কারণ

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-ভেদ যে থাকিবেই। একেবারে ব্রহ্মভূত ন হইলে দুই আত্মা সম্পূর্ণ এক হয় না। আমি বলিয়াছি, উভয়ে ধাতু এক, আকার বা গঠনও এক ; তবু একই মেডেলের দুই পার্শ্বের মত দুইয়ের মুখ কিছু পৃথক, কিন্তু মেডেল একই। আমি বলিতে পারিতাম—একই বীজের ফুল, জলমাটিও এক. কিন্ত এমনই যে, ঋতুভেদে তাহার রঙের পরিবর্ত্তন হইয়াছে যাঁহারা আরও ভিতরে দৃষ্টি করিবেন, তাঁহারা কোন ভেদই মানিবেন না। কিন্তু ভেদ একটু মানিলে বুঝিবার সুবিধা হয় স্বামীজীর দৃষ্টি যেখানে নিবদ্ধ ছিল নেতাজীকে তাঁহার দৃষ্টি তথা হইতে একটু নিম্নে নিবদ্ধ করিতে হইয়াছে, তার কারণ নেতাজীর লক্ষ্য আরও নিকট। স্বামীজী ছিলেন আদৌ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী—পরে দেশ-প্রেমিক, দেশ-হিতব্রতী ; নেতাজী আদৌ দেশ-প্রেমিক, পরে দেশের সেবার জন্যই সন্ন্যাসী। স্বামীজীর প্রতিভা প্রেমের দ্বারা রঞ্জিত হইলেও, জ্ঞানই তাহার প্রধান লক্ষণ ; নেতাজীর প্রতিভায় বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রাধান্য নাই— তাহার শক্তি প্রেমের শক্তি ; জ্ঞান—সেই শক্তির অনুমাত্রিক নেতাজী মুখ্যত কর্ম্মবীর, তাঁহার প্রতিভার চরম নিদর্শন তাঁহার সেই আশ্চর্য্য-কর্ম্মকুশলতা। স্বামীজীর প্রতিভা মুখ্যত এইরূপ নহে, সে প্রতিভা মানুষকে জাগাইবার প্রতিভা ; তাই একজনের নাম "স্বামীজী", অপরের নাম "নেতাজী", দুইটি সার্থক হইয়াছে। স্বামীজীর স্বপ্ন মানুষের আত্মার মতই বিরাট তাহার গৌরবও স্বতন্ত্র ; নেতাজীর স্বপ্ন মানুষের দেহ-প্রাণের

পরিধিতেই সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ করার শক্তিও একটা বড় শক্তি, ইহাই প্রকৃত কর্ম্মবীরের প্রতিভা ; স্বামীজীর সে প্রয়োজন ছিল না, তিনি তখন সাক্ষাৎ কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মের প্রেরণাটাকেই মহৎ ও বিশুদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিলেন ; তাঁহার সেই বৈদান্তিক আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন নাই বলিয়া কাশ্মীরের সেই ঘটনার পর তিনি আত্মসংহরণ বা আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—পুনরায় সেই বিরাটের স্বপ্নে মগ্ন হইয়া হৃদয়ের জ্বালা ভুলিবার উপায় করিয়াছিলেন। নেতাজী যেন ঠিক তাহার পরেই, ঠিক সেইখানেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন—একজন যেন পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, আর একজন গাণ্ডীবধম্বা সব্যসাচী!

কিন্তু স্বামীজী ও নেতাজীর মধ্যে যেখানে গভীরতর একাত্মীয়তা আছে সেইখানে দৃষ্টি বদ্ধ করিতে না পারিলে উভয়ের কাহাকেও আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিব না। নেতাজী যে এক অর্থে স্বামীজীর মানস-পুত্র তাহাতে সন্দেহ নাই ; একজনের হৃদয়ে যাহা বীজরূপে ছিল আরেক জনের জীবনে তাহাই বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়াছে। [তত্ত্বজ্ঞান বা মুক্তিতত্ত্বকেও গৌণ করিয়া যে সাক্ষাৎ-মুক্তি স্বামীজীর অন্তরে একটি প্রবল শক্তিরূপে বিরাজ করিত, নেতাজীও সেই মুক্তিকে অন্তরে লাভ করিয়াছিলেন—দুইজনের প্রেমও সেই মুক্ত-প্রাণের পরার্থ-প্রীতি।] স্বামীজীর যে-হৃদয়—সঙ্কুচিত নয়—আপনাকে দমন করিয়া, যে-কামনাকে চরিতার্থ করিতে চায় নাই, সেই বিশাল হৃদয়ের নিপীড়িত কামনাই নেতাজীর মধ্যে অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ

করিয়াছে। স্বামীজী যদি গেরুয়া ত্যাগ করিতেন তবে সে আর কিছুর জন্য নয়—ঐ আজাদ্ হিন্দ ফৌজের 'নেতাজী' হইবার জন্য। সেই প্রেম তাঁহারও ছিল, কেবল সেজন্য জ্ঞানের তপস্যাকে সংবরণ করিয়া কিছুকাল প্রেমের সমাধিতে সংজ্ঞাহারা হইতে হইত। অতএব স্বামীজীর মধ্যে আমরা যেমন নেতাজীর ঐ প্রেমের মূল দেখিতে পাই, তেমনই, নেতাজীর মধ্যে স্বামীজীর সেই বাণীকেই মূর্ত্তিমান হইতে দেখি—সেই একমন্ত্র—"Believe that you are free, and you will be"।

সর্ব্বশেষে, আমি এই প্রবন্ধের শিরোদেশে স্বামীজীর যে উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও স্মরণ করিতে বলি; দেশের সম্বন্ধে স্বামীজীর ইহাই শেষ উক্তি—মহানির্ব্বাণে প্রবেশ করিবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে এই কয়টি কথা তাঁহাকে আপন মনে অনুচ্চস্বরে বলিতে শোনা গিয়াছিল। "বিবেকানন্দ কি করিয়া গেল তাহা বুঝিবার জন্য আর একজন বিবেকানন্দ চাই—তেমন অনেক বিবেকানন্দ সময় হইলেই আসিবে"। ইহা যে কত সত্য তাহা আজ আমরা নেতাজীকে দেখিয়া বুঝিয়াছি। এতদিন স্বামীজীর এত পরিচয়—তাঁহার জীবন, কর্ম্ম ও বাণীর এত আলোচনা সত্ত্বেও যাহা বুঝি নাই,—কতকটা পরোক্ষ করিতে পারিলেও অপরোক্ষ করিতে পারি নাই—আজ তাহা চিত্তগোচর নয়, চক্ষুগোচর করিতেছি। বিবেকানন্দের সেই বাণী ও কর্ম্ম কি? প্রথমটি এই যে, শত জাতি, শত সমাজ ও শত সম্প্রদায় সত্ত্বেও ভারতবর্ষের আত্মা এক; সেই আধ্যাত্মিক ঐক্যের

উপরেই তিনি এ যুগে এক নূতন মহাভারতের ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন ; ঐ বাণী তাঁহারই বাণী, উহাই জাতীয়তার মন্ত্র-বাণী। এই বাণীই নেতাজীকে অনুপ্রাণিত করিয়া তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিকে সম্ভব করিয়াছে। স্বামীজীর সেই অধ্যাত্ম-দৃষ্টিই নেতাজীর বাস্তব-দৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে, তিনিও সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের ভেদ ঘুচাইয়া, স্বামীজীর সেই ধ্যানলব্ধ 'মহাভারত'কে সাকার করিয়া তুলিয়াছেন। স্বামীজীর অপর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি একটা কর্ম্মনীতির নির্দ্দেশ বা লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথটি—কর্ম্মের প্রাথমিক প্রেরণাটি ধরাইয়া দেওয়া। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সেই প্রত্যক্ষ প্রয়োজনটি এমন করিয়া আর কেহ উপলব্ধি করে নাই। এ বস্তুটি তিনি, ধ্যানে নয়—প্রাণে লাভ করিয়াছিলেন। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আর একবার বলি। তিনি তখন পরিব্রাজকের বেশে সারা ভারত পর্য্যটন করিতেছিলেন—কপর্দ্দকহীন সন্ন্যাসী, নাম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া তিনি সেই বিশাল জনসমুদ্রে যেন আপনাকে আপনি হারাইয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতার গুরুভাইগণ কোন সংবাদই জানিতেন না, তথাপি এ বিশ্বাস তাঁহাদের ছিল যে, তিনি হিমালয়ের কোন নিভৃত প্রদেশে আত্ম-সাধনায় রত আছেন। হঠাৎ, প্রায় দুই বৎসর পরে, দক্ষিণ ভারতের এক রেল-ষ্টেশনে দুইজন গুরুভাই তাঁহার দেখা পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কিন্তু এ মূর্ত্তি ত' নিবাত-নিষ্কম্প জ্যোতিঃশিখার মত নয়! ইহার ভিতরে যে ঝড় বহিতেছে—দুই চক্ষে রুদ্ধবর্ষণ অশ্রুমেঘ! অতঃপর সেই

সন্ন্যাসীর কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—"আমি সারা ভারত ভ্রমণ করিয়াছি—আমার বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জনগণের কি ভীষণ দারিদ্র্য, কি শোচনীয় দুর্দ্দশা দুই চক্ষে দেখিলাম! আমার কান্না থামিতেছে না। এখন বুঝিয়াছি, ধর্ম্মপ্রচার করিবার সময় এ নহে। এই দারিদ্র্য ও দুর্গতি আগে নিবারণ করিতে হইবে। ইহার একটা উপায় চিন্তা করিয়া আমি আমেরিকায় যাইতে মনস্থ করিয়াছি।" ইহার পর স্বামী তুরীয়ানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হরি-ভাই! আমি তোমাদের ঐ ধর্ম্মকর্ম্মের কোন মর্ম্মই বুঝিতেছি না। আমি আমার বুকের মধ্যে একটা বড় জিনিস পাইয়াছি—আমি মানুষের দুঃখ অনুভব করিতে শিখিয়াছি।" স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিয়াছেন, "এ যেন ঠিক সেই বুদ্ধের মত—সেই ভাব, সেই কথা!"

নেতাজীর অন্তরে কেহ প্রবেশ করিয়াছে? যদি করিয়া থাকে তবে বলিয়া দিতে হইবে না, তাঁহার হৃদয়েও ঠিক এই ঘটনাই ঘটিয়াছিল। সেদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাসে —দুইজন পৃথক লেখকের পৃথক কাহিনীতে—দুইবার দুই উপলক্ষ্যে নেতাজীর যে অদ্ভুত ভাব-সমাধির উল্লেখ দেখিলাম, তাহার সম্বন্ধে অন্যত্র বলিব; কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে উহার একটি বড়ই অর্থপূর্ণ। লেখক বলিতেছেন, আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বময়-কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করার উপলক্ষ্যে, বিপুল জন-মণ্ডলীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নেতাজী যখন মাতৃভূমির উদ্ধার-সাধনের সংকল্প বা শপথ-বাণী পাঠ করিতেছিলেন, তখন সেই

পাঠের মধ্যে যেস্থানে ত্রিশকোটী ভারতবাসীর শৃঙ্খল-মোচন ও অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা ও দারিদ্র্য নিবারণের কথা ছিল, সেইখানে আসিয়া তাঁহার কণ্ঠ সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল এবং সারাদেহ পাথরের মত কঠিন ও নিস্পন্দ হইয়া উঠিল—একেবারে বাহ্য-জ্ঞানহীন অবস্থা! প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল তিনি এই অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন! এই যে অলৌকিক অবস্থা—ইহার মূলে ছিল কোন্ অনুভূতি? স্বামীজীর সেই অনুভূতির তীব্রতম রূপ ইহাই। আরও প্রমাণ আছে। আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর স্বামীজী মাদ্রাজের বক্তৃতায় দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে এই কথাগুলি ছিল—

"তোমাদের প্রাণে কি একবারও ইহা জাগে যে, এই দেশের কোটি কোটি নর-নারী কতকাল ধরিয়া, ঘৃণিত পশুর মত চরম দারিদ্র্য ও চরম দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে? সে চিন্তা কি তোমাদিগকে অস্থির করিয়া তোলে—আহার-নিদ্রা ত্যাগ করায়? দেশের এই দুর্গতি মোচনের জন্য তোমরা কেহ কি নাম-ধাম, ধন-জন, পুত্র-পরিবার, এমন কি, নিজের দেহের প্রতিও মমতা ত্যাগ করিতে পার?...এই জীবন্মৃত অভাগাদিগকে উদ্ধার করিবার কোন উপায়, কোন পন্থা কি তোমরা স্থির করিয়াছ? সেই বজ্র-কঠিন সংকল্প কি তোমাদের আছে—যাহার বলে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাও নিমেষে অপসারিত হয়? সমগ্র জগৎ যদি তরবারি হস্তে তোমার পথরোধ করিয়া দাঁড়ায় তথাপি তুমি যাহা সত্য মনে করিয়াছ, তাহা সাধন করিতে কিছুমাত্র ভীত হইবে না—মনের এই বল ও প্রাণের সেই প্রেম যদি থাকে, তবে তোমাদের যে কেহ অতিশয় অলৌকিক ঘটনা ঘটাইতে পারিবে।"

এই বাণী কোন্ অনাগত পুরুষের উদ্দেশে উচ্চারিত হইয়াছিল? সেদিন স্বামীজীর মানস-নেত্রে, তাঁহার তৎকালীন সেই উদ্দীপ্ত হৃদয়ের যজ্ঞানল হইতে, কোন্ বীরমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল? তাঁহার অন্তরের সেই মূর্ত্তিই কি আজ বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায় নাই? স্বামীজী তাঁহার মৃত্যু-দিনে এই বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন যে, তখনও আর একটা বিবেকানন্দ দেখা দেয় নাই,—তথাপি তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল—আসিবে, সময় হইলেই আসিবে; না আসিলে তাঁহাকে কে বুঝিবে—কে তাঁহার কাজ সম্পূর্ণ করিবে? সেই ভবিষ্যৎ-বাণী যে এত শীঘ্র ফলিবে তাহা কে জানিত? আবার সেই সন্ন্যাসী! সেই ত্যাগ, সেই প্রেম! সেই কৌপীনমাত্র সম্বল করিয়া আবার তেমনই—দেশের জন্য দেশত্যাগ। সেবার জগৎ-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলীতে জয় জয়-রব, এবার জগৎ-মহাকুরুক্ষেত্রে 'জয়-হিন্দ্'-রব; সেবার সশরীরে প্রত্যাগমন, এবার প্রত্যাগমন অশরীরে।

গান্ধীজী ও নেতাজী

১

অতিশয় বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের অদৃষ্ট-কটাহে দেবে ও দানবে মিলিয়া যে তরল পদার্থটিকে ঘন ঘন তাড়না করিতেছে, তাহা যে শেষে কি রূপ ধারণ করিবে—পাত্রটির তলদেশ ফাঁসিয়া যাইবে, না ষড়্‌গুণবলিজারিত হইয়া একটি সর্ব্বরোগহর্ মহৌষধির উদ্ভব হইবে—তাহা দেবাঃ ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ ? তথাপি ক্রমেই অবস্থা যেরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহাতে, একটা কিছু চূড়ান্ত যে শীঘ্রই—অন্ততঃ দুই চারি বৎসরের মধ্যে—স্থির হইয়া যাইবে, এমন সম্ভাবনাই অধিক। এ বিষয়ে ভারতবাসী আপামর সাধারণ উদ্বেগ অনুভব করিতেছে, তাহার কারণ, ব্যাপারটা আর কেতাবী রাজনীতির মধ্যেই আবদ্ধ নাই—প্রত্যেক নরনারীর সদ্য জীবন-মরণ-সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। যাহা ছিল মূলে একটা পৃথক রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন, তাহাই জীবন রক্ষায় প্রাণান্তিক চেষ্টা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; সদ্য-সমাপ্ত মহাযুদ্ধের পর, পৃথিবীর অন্যত্রও যেমন ভারতবর্ষেও তেমনই, পূর্ব্বের সমস্যা নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে ; এক্ষণে প্রায় সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদন পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে—এমন আর কখনও হয় নাই। তাই, সকল তত্ত্ব সকল নীতি ঐ একটিমাত্র তত্ত্বে

পর্য্যবসিত হইয়াছে—সন্থ বিনাশ বা মহামৃত্যুর আক্রমণ হইতে রক্ষার উপায়। এখন প্রত্যেক মানুষ প্রতি মুহূর্ত্তে সেই সমস্যাকে একেবারে দেহের দ্বারা অনুভব করিতেছে, কোন দূরতর রাজনৈতিক লক্ষ্য, গভীরতর ও উচ্চতর অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য অপেক্ষা করিবার সময় বা সামর্থ্য নাই। রাজনীতি এখন সাক্ষাৎ অন্ন-নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ভারতবর্ষের মানুষ এতদিনে, বালবৃদ্ধবনিতা-নির্ব্বিশেষে, সকল রাজনীতির মূল-নীতিকে জঠরের সাহায্যেই মস্তিষ্কগোচর করিয়াছে—মৃত্যুর করালমূর্ত্তি তাহার জীব-চৈতন্যে হানা দিয়াছে। এতদিন যাহাকে একটা আদর্শ-প্রীতি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বা মহতের অসন্তোষ বলিয়া সাধারণ নরনারী তেমন গ্রাহ্য করে নাই, আজ তাহাকে অতি ক্রূর বাস্তবরূপে—শ্বাসকষ্টের মত—অনুভব করিতেছে। এই অবস্থার নিদান এবং ইহার আরোগ্য-চিন্তার অধিকার এখন আর কোন দল বা সম্প্রদায়ের নয়—সকলের; এখন আর কোন মতবাদ নয়—যাহা প্রত্যক্ষ তাহাকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রবন্ধে আমি সেই অধিকার সকলকে দিয়া, এই অবস্থার পূর্ব্বাপর ইতিহাস, এবং সেই ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত যে দুইটি প্রধান নায়ক-মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে তাঁহাদের নীতি ও কীর্ত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

* * *

দেশের এই অবর্ণনীয় দুর্দ্দশার মূলে যে একটিমাত্র কারণ আছে—পরাধীনতা, আজ তাহা বালকেও স্বীকার করিবে, কিন্তু

এই পরাধীনতা যে ঠিক কিরূপ সে বিষয়ে খুব স্পষ্ট ধারণা আমাদের কখনও ছিল না। এমন কথা বলিলে বোধ হয় অযথার্থ হইবে না যে, ইংরেজ আসিবার পূর্ব্বে, এবং ইংরেজ অধিকারের প্রথম কিছুকাল আমরা সত্যই পরাধীনতা ভোগ করি নাই, তার কারণ, আমাদের জাতির রাজনৈতিক সংস্কারই অন্যরূপ। রাজাকে আমরা চিরদিন দেশের শান্তিরক্ষক প্রধান প্রহরীরূপেই দেখিতাম; যেখানে প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজন ছিল সেখানে ঐ রাজার সহিত সম্বন্ধ ছিল না; সমাজই ছিল আমাদের প্রকৃত রাষ্ট্র, সেখানে আমরা সত্যই স্বাধীন ছিলাম। রাজার সাময়িক খেয়াল খুশির অত্যাচার সত্ত্বেও আমাদের সেই স্বাধীনতা কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অতএব আজ আমরা যে পরাধীনতার সম্বন্ধে এত সচেতন হইয়াছি, সেই পরাধীনতার সংস্কারও যে পূর্ব্বে ছিল না, ইহা এক অর্থে সত্য। কিন্তু ক্রমেই পরাধীনতা নামক একটি বস্তুর, চেতনা না হউক—বাস্তব অস্তিত্ব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ইংরেজই আমাদের স্বাধীনতা হরণ করিল, কেমন করিয়া তাহাই বলিব।

ইংরেজ শাসনের পূর্ব্বে, ঐতিহাসিক কালে আমরা যত প্রকার শাসনের অধীন হইয়াছিলাম, তাহাতে শাসক জাতির একটা রাজত্বাভিমানই ছিল, তাহাদের রাজপ্রাপ্য যে বশ্যতা—অর্থাৎ রাজা-প্রজা-সম্বন্ধ মাত্র স্বীকার—তাহার বেশি তাহারা চাহে নাই—প্রয়োজনও ছিল না। ইংরেজ যখন এদেশে তাহার শাসন-বিস্তার ও প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠা করিল, তখন আমরা

তাহাদিগকে সেই চক্ষেই দেখিয়াছিলাম, সেই পূর্ব্ব রাজগণের উত্তর পুরুষ বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম; ভিন্ন জাতি বলিয়া শঙ্কিত হইবার কোন কারণ তখন ঘটে নাই। তার কারণ, বিদেশী রাজবংশ জাতি হিসাবে যতই স্বতন্ত্র হউক, তাহাদের সেই 'জাতি' ধর্ম্ম ও সমাজঘটিত একটা পার্থক্যের কারণ হইলেও, তাহাতে কোন রাজনৈতিক বৈষম্য-বিষ বেশিদিন টিকিয়া থাকিত না,—সেই জাতিও দেশেরই একটা জাতিতে পরিণত হইয়া যাইত। এইজন্যই, ভারতবাসী, ইংরেজ-রাজ ও তাহার রাজত্বের আসল রূপ অনেকদিন চিনিতে পারে নাই—তার কারণ, ধূর্ত্ততা ও কূটনীতিতে সেই জাতি জগতে অগ্রগণ্য—ভারতবাসী এখনও তাহার নিকটে বালক মাত্র। ইংরেজ এখানে কোন রাজধর্ম্ম পালন করিতে আসে নাই—সে-ধর্ম্ম সে পালন করে নিজের দেশে; এ দেশ তাহার বিদেশ, এখানে সে বাস করে না—কখনো করিবে না। সে আসিয়াছিল বাণিজ্য করিতে, পরে যখন একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভ করিল, তখন সে তাহার বাণিজ্যের আবরণেই বেপরোয়াভাবে লুঠ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ লুণ্ঠন-নীতিই তাহার রাজনীতি, সেই রাজনীতির সম্যক অনুষ্ঠান-কল্পে সে পুলিশ-বাহিনী, আদালত ও জেলখানা, এবং সেই সকলের খরচপত্র-নির্ব্বাহের জন্য অনেকগুলি দপ্তর—ভারত-গবর্ণমেণ্ট নামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; একদিকে তাহাতে তাহার সেই আসল অভিপ্রায় যেমন সিদ্ধ হইতেছে, অপরদিকে তেমনই শান্তি-রক্ষা ও বিচার প্রভৃতির রাজকর্ত্তব্যও সুন্দর অভিনীত হইতেছে।

ইংরেজ-রাজ যে মূলে পুলিশ-রাজ ইহা কাহারও অবিদিত নাই —সেই পুলিশ যে কোন্ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার দ্বারা ইংরেজের রাজধর্ম্ম যে কিরূপ পালিত হয়, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে।

কিন্তু তথাপি ইংরেজ সহসা এ জাতির স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে নাই—পারে নাই বলিয়াই তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন-মূলক বাণিজ্যও বাধা পাইতেছিল। আমাদের জীবনযাত্রাকে তাহার সেই লুণ্ঠনের অনুকূল করিতে না পারিলে—আমাদের সেই স্বদেশীসমাজের মেরুদণ্ড ভাঙিতে না পারিলে, তাহার সেই রাজ-প্রয়োজন যে সিদ্ধ হইবে না, ইহা সে প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিল। তাই ক্রমে সে আরও দুইটি বস্তুর প্রবর্ত্তনে অধিকতর মনোযোগী হইল—একটি ইংরেজীশিক্ষা, এবং আর একটি তাহার নিজের রাজধর্ম্মসম্মত আইন। ইহার কোনটাতেই কিছু বলিবার ছিল না; একটি পণ্যদ্রব্যের মত, ক্রেতার পছন্দ হয় কিনিবে, কোন বাধ্যতা নাই; আর একটি ন্যায় ও যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, দেশীয়গণের ধর্ম্মশাসন বা স্মৃতিসংহিতার সহিত যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য করিয়া সেই আইন প্রস্তুত হইতেছিল; তাহাতেও কাহার কিছু বলিবার ছিল না। ইংরেজী শিক্ষা সে প্রথমে প্রবর্ত্তন করিতে চাহে নাই, কিন্তু পরে এই জাতির সহিত পরিচয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে পূর্ব্ব আশঙ্কা ত্যাগ করিল—বুঝিতে পারিল যে, উহার ফলে তাহার সর্ব্বপ্রকার ইষ্ট লাভ হইবে, একাধারে গুরু ও প্রভু হইয়া সে পূর্ণ ভক্তি আদায়

করিতে পারিবে। রাজ্যশাসন-নীতি ও আইন প্রণয়ণ সম্বন্ধে সে প্রথম দিকে যেটুকুও অসতর্ক হইয়াছিল, তাহাও আর রহিল না,—সিপাহী-বিদ্রোহ তাহার চক্ষু এমন খুলিয়া দিল যে, সেই হইতে সে আর ভুল করে নাই; তখন হইতেই সে ভারত-শাসন-নীতিকে এমন পাকা করিয়া লইয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত সেই নীতিই তাহাকে সর্ব্বশক্তিমান করিয়া রাখিয়াছে; পরে শাসন-ব্যবস্থার যতকিছু সংস্কার, যতকিছু নূতন আইন সে প্রবর্ত্তন করিয়াছে, তাহাতে সেই এক নীতিই আজও অবিচলিত আছে।

ইংরেজীশিক্ষার যতই বিস্তার হইতে লাগিল, ততই একদিকে যেমন আমাদের দাসত্ব করিবার প্রবৃত্তি ও সুযোগ দুই-ই বাড়িতে লাগিল, তেমনই এক নূতন ধরণের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। ইহার নাম, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা স্বৈরাচারের আকাঙ্ক্ষা। শুনিতে অদ্ভুত বটে, কিন্তু আদৌ অসম্ভব নয়। ইংরেজের দাসত্বও গৌরবজনক—তাহাতে বিবেকের সম্মতি আছে, আত্মার পৌরুষ আছে! কারণ, ইংরেজ সভ্য, এবং ইংরেজ গুরু; সেই ইংরেজীশিক্ষা তাহার বহু কুসংস্কার মোচন করিয়াছে, সে চিন্তার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। [ইংরেজের চেয়ে সে কত ছোট, এই জ্ঞান তাহার যত বাড়িয়াছে, ততই তাহার উপরে ইংরেজের প্রভুত্ব করিবার দাবী সে অন্তরের অন্তরে স্বীকার করিয়াছে। সেই অধীনতায় অগৌরব নাই, বরং সেই অধীনতারূপ তপস্যার দ্বারা সে সভ্যতার উচ্চতর ধাপে আরোহণ করিবে—উদার ও স্বাধীনচেতা, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান প্রভুর সেবা

করিয়া সে সেই প্রভুর সাযুজ্য লাভ করিবে। সেই স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া সে আর স্বদেশীয় সমাজশাসন মানিতে চাহিল না; সে-শাসন তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল, তাহাই হইল প্রকৃত অধীনতা! অর্থাৎ যে শাসন-বিধি তাহার নিজেরই—তাহার নিজেরই জাতীয় স্বায়ত্ত-শাসন, সেই শাসনের স্বাধীনতা-দুর্গকে এতকাল পরে সে স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল। ক্রমে সমাজের শাসন লঙ্ঘন করিতে সে আর ভয় পাইল না; পূর্ব্বে যে সকল আচরণের জন্য সে সমাজের দ্বারা দণ্ডিত হইত, ক্রমে সে ভয় আর রহিল না। [প্রথমতঃ, সে ন্যায়-অন্যায়ের একটা নূতন মানদণ্ড, ইংরেজীশিক্ষার আশীর্ব্বাদে লাভ করিয়াছে; দ্বিতীয়ত, ইংরেজের আইন তাহার সেই স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার সহায়। সেই আইনের দ্বারা সে মূর্খ ও অসভ্য সমাজপতিকে তাহার ঔদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তি দিতে পারে। অতিশয় বর্ত্তমানে এ দেশে যে অধর্ম্মাচরণ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ইংরেজের আইন প্রকারান্তরে তাহার প্রশ্রয়দাতা; একমাত্র সমাজই তাহা দমন করিতে পারিত, কিন্তু সমাজের সেই শাসন-শক্তিও যেমন লুপ্ত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জাতির মেরুদণ্ডও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। [ঐ ইংরেজীশিক্ষা ও ইংরেজের চাকুরীই এজাতির ধর্ম্মনাশ করিয়াছে। গ্রাম-সমাজ ত্যাগ করিয়া দলে দলে সে যখন শহরে আসিয়া ইংরেজের আইনের ছায়ায় স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিল, [তখন হইতে, সে নিজের বাস্তুও যেমন, তেমনই—বহু রাজা ও রাজ্য ও বহু রাষ্ট্রবিপ্লবে অক্ষত—তাহার সেই সমাজ

তাহার সেই স্বাধীনতার একমাত্র দুর্গ স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া ফেলিল, জানিতেও পারিল না, নিজের কি সর্ব্বনাশ করিল। হিন্দুর সমাজ গিয়াছে, তাই আজ সে এত অসহায়; মুসলমানের সমাজ এখনও অক্ষত আছে, তাই তাহার সুযোগ এত, ভরসাও এত।

যতদিন ঐ সমাজ-শাসন ছিল ততদিন কোন রাজশক্তি এ জাতির স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে নাই। ইংরেজ যেদিন নন্দকুমারকে ফাঁসি দেয় সেই দিনই বুঝিয়াছিল, তাহার রাজশক্তির সীমা কোথায়। সে ঐ ব্রাহ্মণ সমাজপতিকে ফাঁসি দিবার সময় ভাবিয়াছিল, সে বুঝি তাহার রাজমহিমাকে আরও নিঃসংশয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিল। কই কোন বিদ্রোহ ত' ঘটিল না! পরে সে বুঝিয়াছিল, বিদ্রোহ ইহারা করিবে না, তাহার কারণ, রাজশক্তির সহিত এ জাতির কোন বিবাদ নাই—সেখানে সে যুদ্ধ করিবে না। নন্দকুমারকে যে শক্তি ফাঁসি দিয়াছে, সে শক্তি নন্দকুমারের সমাজপতিত্বকে ফাঁসি দিতে পারে নাই—পারিবে না। ঐ ঘটনায় সমস্ত দেশ নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, মুক মৌন স্তম্ভিতভাবে, কেবল সেই রাজশক্তির ব্যভিচার দেখিয়াছিল—তাহার দুর্ভেদ্য সমাজ-দুর্গে কোন আঘাত বা আক্রমণ অনুভব করে নাই; সেখানে সে অসীম শক্তিতে শক্তিমান; তাই কেবল তাহার দেহে রাজদণ্ডের সেই অশুচি স্পর্শ ধৌত করিবার জন্য সেদিন সে বধ্যভূমির প্রান্তবাহী পতিতপাবনীর জলে অবগাহন করিয়াছিল। ইংরেজ সে দৃশ্য ভোলে নাই; ওই ব্রাহ্মণ ওই সমাজ থাকিতে সে কখনও এদেশের প্রভু হইতে পারিবে না—শত

মীরকাসেম, শত টিপুস্থলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিলেও, ঐ শক্তিকে সে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিবে না—না পারিলে, এ দেশে রাজত্ব করার যে মূল অভিপ্রায় তাহাও সিদ্ধ হইবে না, ইহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিল। অতঃপর সে কোন্ উপায় অবলম্বন করিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; ইংরেজের মনস্কামনা পূর্ণ হইল, এ জাতির স্বাধীনতার সেই শেষ আশ্রয়টুকুও আর রহিল না, ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ না হইতেই এদেশ সত্যই পরাধীন হইল। এখানে একটা কথা আবার বলি। আমি এ জাতির পূর্ব্ব স্বাধীনতার যে স্বরূপ ও অবস্থার কথা বলিয়াছি, তাহা আজিকার আদর্শে কতটুকু বা কোন্ অর্থে সত্য, সে প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। স্বাধীনতারও ভিন্ন আদর্শ অবশ্যই আছে; প্রতীচ্য আদর্শ, প্রাচ্য আদর্শ, তথা ভারতীয় আদর্শ যে একরূপ হইবে না, ইহাই সত্য। প্রত্যেক জাতিকে তাহার নিজস্ব ঐতিহ্য, তাহার সাধনা ও অন্তরলব্ধ নিঃশ্রেয়সের মানদণ্ডে বিচার করা কর্ত্তব্য। মানুষের সকল আদর্শই আপেক্ষিক, কোনটাই নিরপেক্ষ সত্য নহে। স্বাধীনতার আসল অভিব্যক্তি অন্তরে, সেই অন্তরের দিক দিয়া উহার স্বরূপ বিচার করিতে হইবে। প্রত্যেক জাতি বা সমাজ, কোন না কোন উপায়ে তাহার সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া থাকে, না পারিলে সেই সমাজ ও জাতি ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। ভারতীয় জাতি সকল সেদিন পর্য্যন্ত তাহাদের স্বধর্ম্ম ও সংস্কৃতি, তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, ইহাতেই প্রমাণ

হয়, সে তাহার অন্তরের সেই স্বাধীনতা কখনও হারায় নাই। তাহার আজিকার অবস্থা ও একশত বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, পূর্ব্বে সে কখনও পরাধীন হয় নাই, সত্যকার যে পরাধীনতা তাহা এইবার ঘটিয়াছে; আশা করি তাহার সহস্র লক্ষণ গণিয়া দেখাইতে হইবে না।

অবস্থা যখন এইরূপ, যখন প্রকৃত স্বাধীনতা হারাইয়া আমরা সেই দাসত্বকেই ব্যক্তিসুখ-স্বাধীনতা রূপে ভোগ করিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছি, তখনই ইংরেজের দেখাদেখি আমাদেরও একটা জাতি-অভিমান ও রাষ্ট্রিক আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান জাগিল, এবং তাহা হইতেই ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের জন্ম হইল। এই আন্দোলন যাঁহারা সৃষ্টি করেন তাঁহারা খাঁটি বিলাতীভাবাপন্ন ইংরেজ-শিষ্য। ইঁহাদের প্রায় সকলেই দেশীয় সমাজ ত্যাগ করিয়াছিলেন, অন্ততঃ সেই সমাজের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল না; ইঁহারা ইংরেজ-শাসনকেই নিজেদের সুখ-সুবিধার অনুকূল করিবার জন্য, ইংরেজেরই স্বাধীনতা-ধর্ম্ম ও তাহার স্মৃতি-সংহিতার দোহাই দিয়া—যেন গুরুর সেই সম্পত্তিতে তাঁহাদেরও একটা সহজ অধিকার আছে, এইরূপ মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নানারূপ আবদার অভিমান করিতে লাগিলেন। দেশের জনগণের সঙ্গে ইঁহাদের ত' কোন সম্পর্কই ছিল না; স্বাধীনতা বস্তুটি কি, কাহাদের জন্য, কিসের স্বাধীনতা এ সকল ভাবনাই ছিল না; বরং সত্যকার স্বাধীনতার কথা ভাবিতেও ইঁহারা ভয় পাইতেন। ইংরেজ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে, এবং খাইতে দিবে; জনগণের যে দারিদ্র্য তাহা ত' চির-অভ্যস্ত, এবং একপ্রকার স্বাভাবিক; ইংরেজের নিকটে

শিক্ষালাভ করিয়া যাহারা তাহাদের প্রসাদপিপাসু হইয়াছে তাহাদিগকেই তৃপ্ত করিবার জন্য এমন একটু ব্যবস্থা হইলেই হইল, যাহাতে প্রভুদের সেই প্রসাদ-বিতরণে কিঞ্চিৎ দাক্ষিণ্য থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পদাঘাত প্রাপ্তিও না ঘটে। দাসত্ব যাহাদের পক্ষে বড় সুখকর হইয়াছে, সমাজবন্ধন নাই, রাজ্য-শাসনের ভাবনা বা দায়িত্ব ত' নাই-ই—একটা দেবতুল্য জাতির অভিভাবকতায় যাহারা পরম শান্তিতে বাস করিতেছে—তাহারা সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন চাহিবে কেন? তাহাদের নিকটে সত্যকার স্বাধীনতা অতিশয় ভয়াবহ; তাই প্রভুদের নিকটে তাহাদের সেই শিক্ষা ও সভ্যতার মর্য্যাদাই তাহারা প্রার্থনা করিয়াছিল। ইহাই আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদিপর্ব্ব, তাহাতে স্বাধীনতার একটা ভাববিলাস বা অনুকরণ-মূলক অভিনয়মাত্র ছিল, কোন ক্ষুধাই ছিল না।

থাকিবে কেমন করিয়া? আজ যে বন্ধন-মুক্তির প্রয়োজন হইয়াছে তাহার জন্য এই জাতির নবজন্মের প্রয়োজন, সেই নবজন্ম না হইলে—স্বাধীনতার অভাব-বোধ বা তীব্র ক্ষুধা জাগিবে কেমন করিয়া? ইংরেজ-শাসন ও ইংরেজীশিক্ষার ফলে তাহার সহস্র বৎসরের সংস্কার মিথ্যা হইয়া গিয়াছে; আজ নূতন করিয়া মুক্তিপিপাসা—মুক্তিকামনা চাই, তবে ত' এই স্বাধীনতার অর্থ সে বুঝিবে; যে সংস্কার তাহার কখনো ছিল না, সেই সংস্কার তাহার রক্তের ভিতরে, তাহার আধ্যাত্মিক চেতনায় না জাগিলে সে তাহার জন্য ব্যাকুল হইবে কেন?

তাই এতদিন স্বাধীনতাকে একটা বাহিরের অবস্থা বা ব্যবস্থা মনে করিয়া সে যে সকল আন্দোলন করিয়া আসিতেছে তাহার কোনটাই স্বাধীনতা-যুদ্ধ নয়, তাহার নীতিও অন্য নীতি ; কিন্তু সে কথা পরে।

ইতিমধ্যে ইংরেজ তাহার শাসন-যন্ত্রটি এমনই সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা এতটুকু শিথিল হইবার কোন আশঙ্কা আর নাই। এতদিন যেটুকু ভয় বা সংশয় তাহার ছিল—হয় ত' বা একটু উচ্চ ভাব ও ভাবুকতার মোহও ছিল—নিরন্তর লোভ-বহ্নিতে অযাচিত ইন্ধন লাভ করিয়া তাহা নিঃশেষে লোপ পাইল ; এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে সে যে সকল অভিনব কল-কৌশলের অধিকারী হইল, তাহাতে তাহার সেই লুণ্ঠনকার্য্য যেমন নিপুণতর তেমনই নির্ব্বিঘ্ন হইয়া উঠিল। ইংরেজ শাসনের মূলনীতি—ইংরেজের সেই রাজধর্ম্মের স্বরূপ, আমাদের দেশের মহামনীষীরাও ধরিতে পারেন নাই ; রামমোহন হইতে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কেহই তাহার চরিত্রে সন্দেহ করেন নাই। অথচ ইংরেজের সেই নীতি ক্রমেই অতি সরল ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। রাজ্যশাসন বা প্রজাপালন কখনও তাহার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল না, এ দেশের ধন-হরণই তাহার একমাত্র কাজ, তাহার শাসন-নীতিও সেই এক কার্য্য-সাধনের নীতি। সে প্রথম হইতেই এই জাতির মধ্যে দুইটি ভাগ সৃষ্টি করিল, এক ভাগে সমগ্র জনসাধারণ, আর এক ভাগে কতকগুলি

Rich = Rob India & Come home.

শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত প্রসাদজীবী। নিয়মিত নির্ম্মম শোষণের ফলে একদিকে কদন্ন ও নিরন্নতার বীভৎস অবস্থা, আর একদিকে সেই অবস্থা হইতে অল্পাধিক মুক্ত ও কৃতজ্ঞ একটি দাস-সম্প্রদায়। এই দাস-সম্প্রদায়ের সহিত জনসাধারণের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, সহানুভূতি ত' পরের কথা, এক-জাতিবোধের আত্মীয়তাও থাকিবে না। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; দেশীয় সমাজে উচ্চনীচ-ভেদ থাকিলেও, একটা সামাজিক অন্যোন্য-নির্ভরতা ছিল—সমানুভূতি ছিল, তাহাও আর রহিল না; ইংরেজী শিক্ষিত চাকুরিয়ার দল দেশকে সমাজকে পর করিয়া দিল। একদিকে ইংরেজের আইন যেমন সেইরূপ স্বাতন্ত্র্য-বোধের সহায়তা করিল, অপরদিকে তেমনই বড় বড় চাকুরীর প্রলোভন এবং খেতাব-খিলাতের বদান্য বিতরণ তাহাদিগকে 'প্রভুর পদে সোহাগমদে দোদুল কলেবর' করিয়া তুলিল। এই যে প্রভুভক্ত চাকুরিয়া-সম্প্রদায় ইহারাও যাহাতে কোনরূপ সামাজিক ঐক্য অনুভব করিতে না পারে, প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য পরস্পরের প্রতিযোগিতা করে, একে অপরের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হয়,—সে জন্য চাকুরীতেও, বেতন ও পদমর্য্যাদা অনুসারে কৌলীন্যের নানা মেল-বন্ধন অত্যাবশ্যক হইয়াছে। এইরূপে একটা জাতির সংঘবুদ্ধি বা সামাজিক চেতনা ক্রমে লোপ পাইয়াছে। পুলিশ ও সৈন্যদলভুক্ত অগণিত ক্রীতদাসকে যে কি উপায়ে জাতি ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাও এই

প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অতএব একটা জাতির ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব যদি এমনভাবে নষ্ট করা সম্ভব হয়, তাহার নিরক্ষর জনগণ হইতে অপেক্ষাকৃত চতুর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগুলিকে পৃথক করিয়া এবং তাহাদের সাহায্যেই অপরগুলিকে শোষণ করিয়া, স্বজাতির ধনভাণ্ডার লোষ্ট্ররাশির মত স্বর্ণরাশির দ্বারা পূর্ণ করা যায়, তবে অভিপ্রায় সিদ্ধির বাকি কি রহিল?

আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় যাঁহারা কংগ্রেস নামক জাতীয় মহাসভার পত্তন করিয়াছিলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বাধীনতা চান নাই, ইংরেজের এই শোষণ-নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন নাই—সে জ্ঞানই তাঁহাদের ছিল না। এই শোষণ-নীতি যখন ধরা পড়িল, তখনও তাহা নিবারণের উপায় কি? ইংরেজের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক রফা বা চুক্তি? কথাটা এইখানেই তুলিলাম, তার কারণ, আমরা স্বাধীনতা শব্দটি আজকাল বড় বেশি ব্যবহার করিতেছি, অথচ বেশ বুঝিতে পারা যায়, জনগণ যাহাই বুঝুক—নেতারা শেষ পর্য্যন্ত একটা চুক্তি করিতেই চান। সেই চুক্তি বা রফা করিতে হইলে ইংরেজের ভারত-শাসন-নীতিই ত্যাগ করিতে হয়, তাহার রাজত্বের কোন প্রয়োজনই থাকে না। রাজত্বের জন্যই সে রাজত্ব চায় না, সে চায় ভারতের ধন-হরণ; তাহা করিতে হইলে ভারতের দারিদ্র্যমোচন ত' নহেই, সেই দারিদ্র্যের মাত্রা এমন হওয়া চাই, যাহাতে তাহার বিদ্রোহ করিবার সামর্থ্যই না থাকে। ঐ ভেদনীতি এবং এই দারিদ্র্য,

এই দুইটিই ইংরেজের প্রধান অস্ত্র, ইহার একটিও শিথিল করিলে, তাহার রাজত্বই বৃথা হইয়া যাইবে। অতএব কোনওরূপ রফা বা আপোস করা তাহার পক্ষে আত্মহত্যারই নামান্তর। এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝিয়া না লইলে আমাদের সকল প্রয়াস ও সকল চিন্তাই মিথ্যা হইবে। ইংরেজ কোনরূপ রফা করিবে না, করিতে পারে না—সে হয় তাহার সেই নীতির অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষের অষ্টপৃষ্ঠে নাগপাশবন্ধন দৃঢ় করিয়া রাখিবে, নয় একেবারে এদেশ ছাড়িয়া যাইবে। ছাড়িয়া যাইবে কেন? এবং কখন? কোন প্রয়োজন আছে কি? তাহার শক্তি কিছু কমিয়াছে? সেই নীতির প্রয়োগ কি পূর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ হইয়াছে? সেই ভেদনীতি কি আরও জয়যুক্ত হয় নাই? জনসাধারণকে সে ভয় করে সত্য—ভয় করে বলিয়াই, সে দুর্ভিক্ষের অবস্থাকে আরও কঠিন ও স্থায়ী করিয়া তুলিয়াছে; সে জানে মানুষকে পশুতে পরিণত করিবার এমন অব্যর্থ উপায় আর নাই, তাই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা যাহার নাম হইয়াছে **Civil Supply** তাহাকে নিজের বজ্রমুষ্টিতে শক্ত করিয়া ধরিয়াছে—যত চেষ্টা, যত চুক্তি, যত রফা কর—উহাকে এমন করিয়া বাঁধিয়া লইয়াছে যে, ঐ গ্রাসাচ্ছাদনের ভার যদি দেশীয়দের হাতেই তুলিয়া দেয়, তবে দেখা যাইবে, অভাবের গহ্বর এমনই যে, কিছুতেই তাহা পূর্ণ করা যায় না। ঐ জনসাধারণকেই সে ভয় করে, তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা; সম্প্রতি সেই ব্যবস্থা আরও পাকা করিয়া লইয়াছে। অপর দিকে,

জনসাধারণের নাম যে করিবে, তাহার পক্ষে কোনরূপ আন্দোলন করিবে, সে-ই তাহার শত্রু, তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে দমন করিবে—ইহাও তাহার সনাতন নীতি। আর একটি যে উপায় তাহাও চিরদিন তাহার করায়ত্ত থাকিবে ;—জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন একটি পৃথক দাস-সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া—চাকুরী প্রভৃতির লোভ দেখাইয়া, নানাবিধ উচ্ছিষ্ট বিতরণ করিয়া তাহাদেরই সাহায্যে জনগণকে নানা কৌশলে মুগ্ধ প্রতারিত ও বঞ্চিত করিয়া রাখা—সেই সম্প্রদায়ের লোভকে সর্ব্বপ্রকারে প্রশ্রয় দিয়া নিজের লোভের অনুকূল করিয়া লওয়া। ইহারও খুব বড় উপায় সে করিয়া লইয়াছে, তবে আর তাহার ভাবনা কি ?

এ পর্য্যন্ত আমি ব্যাধি ও তাহার নিদান আলোচনা করিলাম, ইহা হইতে আর কিছু না হোক, একটা বিষয়ের পরিষ্কার ধারণা হইবে, তাহা এই যে, ভারতবর্ষের সমস্যা—ইংরেজ শাসনের আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত—একই ; সেই সমস্যা ক্রমশ আরও দারুণ, আরও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে ; ইংরেজের নীতি এতটুকু টলে নাই, তাহার শক্তিও কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই ; আমরা যত চীৎকার করিয়াছি, যত উৎপাত উপদ্রব করিয়াছি, এবং মনে করিয়াছি, বুঝি এইবার জয়ী হইতে বিলম্ব নাই—ততই আমাদের সেই আশা সুদূরপরাহত হইয়াছে, আজও আমরা ঠিক এক স্থানেই আছি ; যদি কিছু অগ্রসর হইয়া থাকে—সে ইংরেজ ; এবার সে তাহার সকল

অস্ত্রগুলিকে সমান কার্য্যকরী করিয়া তুলিয়াছে—বঞ্চনা ও প্রতারণায় সে তাহার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। আরও বুঝিতে পারা যাইবে, এ ব্যাধির ঔষধ একটিই আছে—দ্বিতীয় কিছু নাই, সে ঔষধ কি ? কিন্তু এখনও আমার কাহিনী শেষ হয় নাই।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন ইংরেজের এই নীতি প্রথম পূর্ণ প্রকট, অর্থাৎ নগ্নমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইল, তখন ভারতীয় কংগ্রেস-আন্দোলনকে সম্পূর্ণ ভিন্নপথে চালনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী একটা বড় বিস্ময় ও আশ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের কোন বিস্তৃত পরিচয়ের প্রয়োজন নাই—এখনও তাহা চোখের সম্মুখেই শেষ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গান্ধীজী প্রথম হইতেই পুরাতন কংগ্রেসের ভুল বুঝিয়াছিলেন; যাহা সত্য নহে, যে আন্দোলনের কোন অর্থই নাই তাহাকে তিনি তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিলেন; অর্থাৎ তিনি ঐ উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত ভারতবাসীর অভিমানতৃপ্তির জন্য, ইংরেজ-প্রভুর নিকট হইতে কয়েকটা সুবিধালাভকে প্রকৃত সমস্যা বলিয়া স্বীকার করিলেন না; এবং আর একটি যাহা নিশ্চিত বলিয়া স্থির করিলেন তাহা এই যে, স্বাধীনতা নামক কোনরূপ রাষ্ট্রিক মর্য্যাদালাভ—একটা ভাবগত গৌরবের বস্তুই পরম পুরুষার্থ নয়; দারিদ্র্যনিপীড়িত দুঃস্থ জনগণের যেটুকু দুঃখনিবারণ হয় তাহাই সর্ব্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়; এবং যে উপায়ে তাহা ঐ ইংরেজ-শাসন সত্ত্বেও সম্ভব, তাহাই প্রকৃষ্ট উপায়। গান্ধীজী কখনও ভারতের সেই স্বাধীনতা, অর্থাৎ ইংরেজের শাসন-পাশ হইতে আদৌ মুক্তিলাভটাকেই একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন নাই, ইহা যাহারা বুঝে নাই, তাহারা গান্ধীজীকে ভুল বুঝিবে—ভুল

বুঝিয়াছে বলিয়াই এখনও মোহগ্রস্ত হইয়া আছে। গান্ধীজী এই ধারণার মূলে আছে সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মনোভাব অর্থাৎ আমাদের তুলনায় ইংরেজ-চরিত্রের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস; দ্বিতীয় কারণ, তাঁহার সেই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কার,—স্বাধীনতা বলিয়া পৃথক কোন বস্তু নাই, একটা বস্তুই আছে, তাহার নাম মুক্তি, তাহাও ব্যক্তির ব্যক্তিগত সাধনা—তাহা ঠিক রাষ্ট্রিয় বা জাতীয় স্বাধীনতা নয়; মানুষ সেখানে স্বতন্ত্র; সামাজিক হিসাবে, লোকহিতব্রত বা দুঃখীর দুঃখমোচনই একমাত্র সত্য-কর্ম্ম; জনসেবার দ্বারা যে চিত্তশুদ্ধি হয় তাহাই সেই মুক্তি-লাভের সোপান। ইহাই তাঁহার হৃদ্‌গত বিশ্বাস। তিনি এখনও বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের যুগে বাস করিতেছেন। যুগধর্ম্মের বশে মনুষ্য সমাজে যে সকল নূতন ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়, এবং তাহার জন্য যে নূতন ঔষধের প্রয়োজন—তিনি তাহা স্বীকার করেন না, কারণ, তাঁহার মতে জগতের মূল ব্যাধি এক, তাহা আরোগ্য করিতে হইলে সেই এক শাশ্বত সনাতন ঔষধই যথার্থ।

এই যে মনোভাব ইহার সম্যক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এখানে সম্ভব নয়, আবশ্যকও নাই। তথাপি এখানে একটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুবোধ্য কারণ নির্দ্দেশ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রত্যেক মানুষের যেমন জাতিগত, বংশগত ও সমাজগত সংস্কার আছে গান্ধীজীরও তাহা আছে; এবং যেহেতু তিনি অসাধারণ চরিত্র-শক্তিমান পুরুষ, সেই জন্য ঐ সকল সংস্কার তাঁহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় স্ফুরিত হইয়াছে। একে ভারতীয় সংস্কারের অধ্যাত্ম-

প্রীতি, তাহার উপরে জৈনধর্ম্মের প্রভাব, এবং তাহারও উপরে, তাঁহার রক্তগত বৈশ্য-বুদ্ধি। ইহার কোনটাই জাগতিক ব্যাপারে কোন পার্থিব আদর্শ-নিষ্ঠার অনুকূল নয়। ভারতীয় অধ্যাত্ম-সংস্কারে একরূপ বৈরাগ্যই স্বাভাবিক,—জাগতিক যতকিছু অহিত বা অমঙ্গল তাহা শেষ পর্য্যন্ত এমন কিছু নয় যাহার জন্য, সেই আত্মার স্বাস্থ্যহানি করা যাইতে পারে। জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রায় সগোত্র, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার হিংসাই পাপ—অহিংসা বা **non-resistance**ই ধর্ম্ম; শক্তির বিরুদ্ধে শক্তির প্রয়োগ অপেক্ষা আত্মদমনই বা নিষ্ক্রিয়তার প্রতিরোধই কল্যাণকর; আঘাত যদি প্রতিঘাত না পায় তবেই সকল আঘাত আপনিই নিরস্ত হইবে, অমঙ্গলের জড় নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহাই কোন একযুগের ভারতীয় তত্ত্বচিন্তার ফল, এ চিন্তার মূলে আছে সৃষ্টিকে একরূপ অস্বীকারের দ্বারা নির্ব্বিষ অর্থাৎ নিঃসত্ত্ব করিয়া তোলা। ইহার ফল কি হইতে পারে ভারতের ইতিহাসও তাহার কতক পরিমাণ সাক্ষ্য দিবে, এবং জাগতিক ব্যাপারে ইহাকে সম্ভব করিয়া তোলা সম্ভব কিনা, মানুষের ইতিহাস, এবং মানুষের সহজ বুদ্ধি তাহা বলিয়া দিবে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ঐ তত্ত্বই ভারতীয় মনীষা বা সাধনার একমাত্র তত্ত্ব নয়, উহা একটা আংশিক তত্ত্ব মাত্র, বরং প্রধান চিন্তাধারার বিরোধী—যদিও বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব, গীতা হইতে শঙ্কর-দর্শন পর্য্যন্ত, তথা ভারতীয় হিন্দুসাধারণের ধর্ম্মীয় চেতনায় আজিও প্রচ্ছন্ন, এমন কি, কোন কোন সমাজে প্রবল হইয়া আছে।

গান্ধীজীর চিত্তে এই তত্ত্বই আর সকল তত্ত্বকে পরাভূত করিয়া বিরাজ করিতেছে। তারপর, তাঁহার রক্তগত বৈশ্য-বুদ্ধি, অর্থাৎ বণিক-মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তির বশে তিনি আদান-প্রদান বা লেন-দেন, ও আপোষকেই, সর্ব্ববিধ উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ নীতি বলিয়া বিশ্বাস করেন। বণিককে সর্ব্বদাই দুইপক্ষের কথা ভাবিতে হয়, এবং অপর পক্ষের তুষ্টিসাধনের জন্য, সকল সময়েই রফা করিতে হয়। ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'make up'—গান্ধীজীর ব্যক্তিমানসের, তথা চরিত্রেই সেই 'make up' ইহাই; তাহাকে একটা অতিমানবীয় বলিয়া বিস্ময় বিমূঢ় হইবার কোন কারণ নাই। তাঁহার ব্যক্তিত্বের যাহা কিছু অসাধারণত্ব তাহা আর কিছু নয়—সকল শক্তিমান পুরুষেরই যাহা তাহাই—অদম্য আত্ম-বিশ্বাস, এবং সেই বিশ্বাসের বস্তুকে আর সকলের উপরে আরোপণ করিবার 'zeal' বা একাগ্র বাসনা। এইরূপ মানুষ পৃথিবীতে বিরল নয়, এমন কি ইহাদের অপেক্ষাও শক্তিমান পুরুষ দুর্লভ নহে; কিন্তু ইতিহাস বা কালের কতকগুলি লগ্ন আছে, সেই লগ্ন যদি এইরূপ জীবনের সহিত যুক্ত হয় তবেই গান্ধীজীর মত পুরুষের অভ্যুত্থান ঘটে; লগ্ন যদি অনুকূল না হয় তবে তাহা অপেক্ষাও মহত্তর ব্যক্তি ইতিহাসের অগোচর থাকিয়া যায়।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। গান্ধীজীর সাধনতত্ত্বের মূলে আছে ভক্তি ও বৈরাগ্য; ভক্তি অর্থে—একটা বিরাট শক্তি, যে শক্তি দুর্জ্জেয় হইলেও মঙ্গলময়—সেই শক্তির নিকটে আত্মসমর্পণ (ইংরেজও সেই শক্তির অংশ); এবং বৈরাগ্য

অর্থে—গীতার সেই "মা ফলেষু কদাচন"। তিনি নিজে সেই শক্তির সেবকমাত্র, তাহার সহিত সমকক্ষতা লাভের স্পর্দ্ধা তাঁহার নাই, তাই তাঁহার যুদ্ধও অন্তর্মুখী, বহির্মুখী নয়। যে শক্তি বহির্জগতের সকল ব্যাপারে মানুষকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে, এবং সেই যুদ্ধশক্তির পরীক্ষা দ্বারাই তাহার আত্মারও উদ্বোধন করিতেছে, সৃষ্টির সেই নিয়মকে গান্ধীজী মানেন না; সেই আধিভৌতিককেই তিনি আধ্যাত্মিকের সম্মান দিতে রাজী নহেন। তিনি শক্তিপন্থী নহেন, ভক্তিপন্থী; তিনি যাহাকে শক্তি বলেন, তাহা নিজের মধ্যে নিজেকে শাসনে রাখিবার শক্তি—বাহিরের রাজ্য শত্রুকে ছাড়িয়া দিয়া অন্তরে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের শক্তি; ইহা সেই—"Render unto Cæser what is Cæser's due"। ভারতবর্ষে মানুষ যে পরাধীন, সেটা একটা বড় সমস্যা বা দুর্ঘটনা নয়—তাহার বিপরীত যাহা—গান্ধী-ধর্ম্মে সেই স্বাধীনতার কোন পারমার্থিক মূল্য নাই, কারণ সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার জন্য বহু জাগতিক ও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। তবে, মনুষ্যজীবনের নিঃশ্রেয়স কি? পরহিতব্রতের দ্বারা—জনসেবার দ্বারা—নিজ নিজ আত্মার উন্নতি সাধন; তাহাতেই প্রত্যেকের যথাকালে মুক্তিলাভ হইবে, সে মুক্তিলাভ এখনই না হয়, না হইবে; কিন্তু ঐ পরহিতব্রত —দুঃখীর দুঃখ-মোচন—অহিংসা ও সত্যাগ্রহের দ্বারা যতটুকু সাধ্য—তাহাই এখন করিতে হইবে।

এই ধর্ম্ম ও এই নীতি গান্ধীজী কখনও ত্যাগ করেন নাই।

তিনি ইংরেজের রাজশক্তির সঙ্গে যে বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন —ইংরেজ-শাসন হইতে মুক্তিলাভই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না; ইংরেজ রাজাই থাকুক, তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই, সে কেবল ভারতের দরিদ্র দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য অন্নবস্ত্রের স্বচ্ছলতা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ সুব্যবস্থা করিয়া দিক, ইহার অধিক তিনি দাবী করেন নাই। আদি-কংগ্রেস যে স্বাধীনতার ভাব-বিলাস করিত, এবং পরে, এই বাংলাদেশে ও মহারাষ্ট্রে স্বাধীনতার যে আদর্শ ও আবেগ কিছুকালের জন্য প্রকাশ পাইয়াছিল তিনি প্রথম হইতেই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। রাষ্ট্রীয় অর্থে ঐ স্বাধীনতালাভ চিরদিন তাঁহার চিন্তায় গৌণ—ইংরেজের নিকট হইতে ঐ কয়েকটি অধিকার আদায় করিয়া লওয়াই ছিল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। তাহার জন্য ইংরেজকে তাড়াইতে হইবে না, সে আপনিই তাহা দিবে; তাহার ভিতরে যে মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব আছে তাহাকে জাগাইতে পারিলেই হইল, এবং তাহা জাগিবেই। ইহার জন্য ভারতবাসীকে তপস্যা করিতে হইবে—ইংরেজের চরম অত্যাচার ও পাশবিক নিষ্ঠুরতাকেও হাসিমুখে সহ্য ও ক্ষমা করিতে হইবে—যেন এতটুকু হিংসার উদ্রেক না হয়; ধর্ণা ও প্রায়োপবেশন ত আছেই। এই একটি উপায় ছাড়া অন্য উপায় নাই। যদি ইহা কঠিন বা দুঃসাধ্য হয় তবে বুঝিতে হইবে তোমরাই এখনও উপযুক্ত হও নাই; ইংরেজের দোষ নয়, দোষ তোমাদেরই। তবু সকলেই স্বাধীনতার নামে পাগল। গান্ধীজী যেন মৃদু হাস্যে বলেন,

আচ্ছা তাহাই হইবে, কিন্তু আগে ঐ কাজটি কর দেখি? অবোধ বালককে এমনই করিয়া ভুলাইতে হয়, নহিলে তাহাদের মঙ্গল-সাধন করা যে অসম্ভব! ইহার পর, তিনি ইংরেজ ও মুসলিম লীগের সঙ্গে যে প্রেমের বা অহিংসার যুদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে পদে পদে কি ফললাভ হইয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। গান্ধীজী ক্রমে তাঁহার দাবী বাড়াইয়াছেন বটে, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত একটা পাকে পড়িয়া ইংরেজকে 'কুইট ইণ্ডিয়া' বলিয়া ধমকও দিয়াছেন, তবু তিনি যে সত্যই তাহার সবটুকু আশা করেন নাই, আমার এই আলোচনা এবং গান্ধীজীর সদ্যতম আচরণ হইতে, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না।

গান্ধীজীর ধর্ম্মতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবাদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; গান্ধীজীর ত' কথাই নাই, ব্যক্তিমাত্রেরই ব্যক্তিগত বিশ্বাসে অধিকার আছে—ভারতবর্ষে সেই অধিকার আরও অব্যাহত। ব্যক্তির আত্ম-মানসে মিথ্যাও সত্য হইতে পারে—যদি বিশ্বাসের জোর থাকে, তবে জগতের দিকে চক্ষু বুজিয়া, একটা নিজস্ব ভিন্ন জগৎ মনে মনে সৃষ্টি করিয়া, আত্ম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা আদৌ অসম্ভব নয়; আলানস্করের মনোরাজ্যও সত্য—যদি সেই দিবাস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিবার মত কোন শক্তি বাহিরে না থাকে। কিন্তু ইংরেজ-শাসন ও তাহার সেই ক্রূর-কঠিন নীতি একটা বড় সত্য, তাহার সহিত রফা যে চলে না! গান্ধীজী এ পর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটি ইংরেজের ঐ নীতির দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে বাধ্য,

ইহা যাহারা বুঝিবে না তাহাদের প্রত্যেককে মহাত্মা গান্ধী হইতে হইবে, অন্যথা অন্ধ অথবা ভণ্ড না হইয়া উপায় নাই। আসল কথা, ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজী খুব বেশি চিন্তিত নহেন ; ইংরেজকে বিশ্বাস করিতেই হইবে, বিশ্বাস করিতে পারিলেই ঐ অহিংসা ও সত্যাগ্রহের বলে অনেক পথ খুলিয়া যাইবে ; সে পথ সংগ্রামের পথ নয়, মৈত্রীর পথ ; তাহাতে স্বাধীনতা লাভ না হউক, যাহা প্রকৃত কল্যাণ তাহাই লাভ হইবে। এই যে দুঃস্থ ও দুর্গতগণের দুঃখ-মোচন—ইহার তুল্য ধর্ম্ম নাই ; কেবল স্বাধীনতা লাভ বলিতে লোকে যাহা চায় তাহাও একটা পাপ-প্রবৃত্তি, প্রকৃত স্বাধীনতা ঐ হিতসাধনের স্বাধীনতা—ইংরেজ এ দেশে থাকা সত্ত্বেও সেই স্বাধীনতার যথেষ্ট অবকাশ আছে। তাহার সাধনপ্রণালী বা কর্ম্মপদ্ধতিও তিনি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। উহা পালন করিতে পারিলেই চতুর্ব্বর্গ লাভ হইবে—ঐ ধর্ম্ম এমনই যে উহাতে নিষ্ফলতার আশঙ্কাও নাই, কারণ—"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥" আমার মনে হয়, ইহাই গান্ধী-ধর্ম্মের ও গান্ধী-কর্ম্মের সারতত্ত্ব—ইহাই বুঝিয়া লইতে পারিলে গান্ধী-কংগ্রেসের কোথাও প্রত্যবায় দেখা যাইবে না। ভুল আমরাই করিয়াছি, আমরা বিলাতী আদর্শে, স্বাধীনতাকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছি, অথচ তাহার জন্য গান্ধী-নীতিকেই বরণ করিয়াছি—না করিয়া উপায় নাই ; এজন্য, আমাদেরও যেমন, গান্ধীজীরও তেমনই বিড়ম্বনার অন্ত নাই।

৪

গান্ধী-মন্ত্র ও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত কংগ্রেসী-ভারতের কথা বলিয়াছি, এইবার উহার প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত যে আর এক তন্ত্র তাহার কথা বলিব। এই তন্ত্র গান্ধী-ভারতের নহে, ইহা বাংলাদেশের—বাঙালীর; ইহার পন্থাও স্বতন্ত্র। ইংরেজ-আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই দেশে, একটা বিশিষ্ট জাতির ধ্যানে ও জ্ঞানে ভারতীয় সংস্কৃতি একটা নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল, এই বাংলাদেশেই ভারতের সেই সমগ্র অতীতের সহিত বর্ত্তমানের একটা বোঝাপড়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। এখানেই সেই অতীতের দুয়ার সবলে ভাঙ্গিয়া অত্যুগ্র বর্ত্তমান প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল,—সে আসিয়াছিল ঐ বণিক-দস্যুর ছদ্মবেশে; তখনও, পূর্ব্বসীমান্তের এই নিভৃত পল্লী-প্রদেশ—কবির ভাষায়—

> "শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল নির্ম্মল শ্যামল উত্তরী
> তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লীসন্তানের দল ছিল বক্ষে করি।"

ভারতবর্ষে এমন মানুষ পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই, বাঙালীও তাহার আকারে-প্রকারে ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গেল, এবং 'গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করিয়া' নিজ গৃহে চুপে চুপে বরণ করিয়া লইল। সেই অতিথি যখন তাহার অজ্ঞাতসারে সর্ব্বস্ব হরণ আরম্ভ করিয়াছে, তখন এই দারিদ্র্যব্রতী, ভাবস্বপ্নাতুর তত্ত্বপিপাসু

জাতি তাহারই মুখে এক নূতন জগতের অফুরন্ত রূপকথা শুনিয়া ভক্তিবিস্ময়ে বিহ্বল হইতেছিল। সেই রূপকথার মধ্যে সে এক নূতন রাজপুরী ও রাজকন্যার সন্ধান পাইল,—জীবন ও মৃত্যুর, প্রেম ও পৌরুষের, ক্রন্দন ও উৎসবের—এক নূতন রস ও নূতন তত্ত্ব সে হৃদয়-গোচর করিল; ইংরেজের দ্বারা বাঙালী যেমন মুগ্ধ হইয়াছিল এমন আর কোন ভারতীয় জাতি হয় নাই। তাহার সেই ছলনা সে কেমন করিয়া বুঝিবে? ইংরেজ জাতির চরিত্রে যে পরস্পরবিরোধী দুই দিক আছে, যাহার জন্য সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বণিক ও শ্রেষ্ঠ কবি, এবং যে কারণে সে চিরদিন "Perfidious Albion" নামে পরিচিত হইয়াও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে—তাহার সেই অপার ছলনা এই সরল ভাবপ্রবণ জাতি বুঝিবে কেমন করিয়া? তাহার চরিত্রের একটা দিকই সে সেই প্রথম পরিচয়ের যুগে কিছু বেশি করিয়াই দেখিয়াছিল; তাহার কারণও ছিল, য়ুরোপে তখন একটা নূতন হাওয়া বহিতেছিল, সেই হাওয়া ইংরেজের গায়েও লাগিয়াছিল। তথাপি ইংরেজ-চরিত্রের সেই রহস্যভেদ করিতে অনেকদিন লাগিয়াছিল, এবং ভেদ করিতে পারিলেও সেই ভক্তি তাহার অন্তর হইতে কিছুতেই দূর করিতে পারে নাই, ইংরেজ তাহার আত্মার উপরে চাপিয়া বসিয়াছিল। ইহার প্রমাণ, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষেও রবীন্দ্রনাথের মত কবি-মনীষী বলিতেছেন—

"ইংরেজের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, ইংরেজ তাহা যে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সে জন্যও আমরা দায়ী আছি। আমাদের

দৈন্য ঘুচিলে তবে তাহাদের কৃপণতাও ঘুচিবে” [ইহাকেই আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর মনোভাব বলিয়াছি—মহাত্মা গান্ধীর এই মনোভাব এখনও পুরামাত্রায় আছে।]

“ভারতবর্ষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ইংরেজের লোভকে, ঔদ্ধত্যকে, ইংরেজের কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতাকেই উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে, একথা যদি সত্য হয় তবে সেজন্য ইংরেজকে দোষ দিলে চলিবে না, এ অপরাধের প্রধান অংশ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।”

“নিজের দেশকে যখন আমরা নিজের চেষ্টা নিজের ত্যাগের দ্বারা নিজের করিয়া লইব,....তখন ভারতবর্ষে আমরা ইংরেজদের সহযোগী হইব, তখন ইংরেজকে আমাদের সঙ্গে আপোষ করিয়া চলিতে হইবে।” [স্বাধীনতালাভের কোন চিন্তাই ইহাতে নাই !]

এইরূপ মনোভাবের একটা কারণ, ইংরেজের দেশে যাহারা ইংরেজকে দেখিয়াছে, তাহারা ভারতবর্ষে যাহাদিগকে দেখে তাহাদিগকে সেই জাতি বলিয়া মনে করে, না করিয়া পারে না ; সেই জাতি নিজ দেশে এমন ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ, ও চরিত্রবান হইয়া, ভারতবর্ষে আসিয়া এমন মূর্ত্তি ধারণ করে কেন—ইহা বুঝিয়াও কেহ বুঝিতে চাহেন নাই, অথচ ঐ রবীন্দ্রনাথই একথাও বলিয়াছেন যে—

“যে সকল জাতি মনুষ্যে মনুষ্যে ব্যবহারে সত্যের মর্য্যাদা রাখে, ন্যায়াচরণকে শ্রেয়োজ্ঞান করে....রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহাদেরও ধর্ম্মবোধ অসার হইয়া পড়ে।”

আশ্চর্য্য নয় কি ? এত জানিয়া, এত বুঝিয়াও ইংরেজ-ভক্তির মোহ কিছুতেই ঘোচে না ! ইহার পর, “ছোট ও বড়”

নামক একটি অতিশয় উপাদেয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ-চরিত্রকে, দেশকালভেদে, দুই ভাগে ভাগ করিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। আসল কথা, ইংরেজের স্বজাতিপ্রেম ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠাই যেমন তাহার মহত্ত্বের হেতু, তেমনই, ভারত-অধিকার ও লুণ্ঠন-বৃত্তির হেতুও যে তাহাই, এবং একটি যেমন গভীর, অপরটিও তেমনই দুর্দ্দমনীয় ও অপরিহার্য্য, ইহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। আরও কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি—ঐ ইংরেজের মারফতেই বাঙালা এক নূতন দৃষ্টির অধিকারী হইয়াছিল, ইংরেজ-চরিত্রের সেই অপর দিকটি হইতে সে তাহার বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টি কিছুতেই ফিরাইতে পারে নাই। ডেভিড হেয়ারের মত ইংরেজকে সে ভুলিতে পারে না; **Edwin Aenold**-এর **Light of Asia** পড়িবার সময়ে সে তাহাকে তাহার আত্মার দোসর বলিয়া মনে করে। তাই বলিতেছিলাম, ইংরেজের মধ্যে যেটুকু মনুষ্যত্ব এমন কি দেবত্ব ছিল, বাঙালীর মত আর কেহ তাহার পূজা করে নাই।

এই পূজা করিয়াছিল বলিয়াই, ইংরেজ যাহাকে তাহার বাণিজ্যের বিনিময়-পণ্য করিয়াছিল, বাঙালী তাহাকেই পরমার্থের পাথেয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। অবশেষে, ইংরেজ-গুরুর নিকটেই সে যে মন্ত্রদীক্ষা পাইয়াছিল—ইংরেজের ইতিহাস ও ইংরেজী সাহিত্যের সেই জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় তাহার চক্ষু ক্রমে উন্মীলিত হইতে লাগিল, তখন সেই ছলনাও সে বুঝিল। ইংরেজের সেই জাতিপ্রেম-মন্ত্রকে সে আপন ধর্ম্মে শোধন করিয়া,

ইংরেজের বজ্রমুষ্টি হইতে গ্রীবা মুক্ত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। ততদিনে ইংরেজ তাহার পল্লীজাবনে হানা দিয়া শুধুই শাকান্ন হরণ করে নাই, সে তাহার সেই শেষ আশ্রয় সমাজটাকেও ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তখন বড় ভয় বড় বেদনা জাগিল; গুরু ইংরেজের নিকটেই সে যাহা শিখিয়াছিল তাহাকেই দীপবর্ত্তি করিয়া সে এইবার আপন দেশের, আপন জাতির ইতিহাস উল্টাইতে লাগিল—অতীতের সেই ভগ্নপ্রাসাদ ও জীর্ণ কুটীরে যাহা কিছু কুড়াইয়া পাইল, তাহাই সেই নূতন আলোকে নূতন করিয়া পাঠ করিল। বেদান্ত ও উপনিষৎ, বুদ্ধ ও কৃষ্ণ, ব্যাস ও শঙ্কর—তাহার মনে এক নূতন ভাষায় কথা কহিতে লাগিল, সেই সনাতন-তত্ত্বই যুগের ছন্দে নূতন বাণী রচনা করিল। সে আবার ভাগীরথী তীরে পিতৃতর্পণ করিতে বসিল। তাহার আসন নির্দ্দেশ করিলেন বঙ্কিম; তিনিই নবযুগের মধ্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে স্থাপনা করিয়া এক নূতন তত্ত্বের ইঙ্গিত করিলেন—তাহা জৈন নয়, বৌদ্ধ নয়, বেদান্তও নয়, বৈষ্ণবও নয়; সে এক নূতন শক্তিমন্ত্র, তাহার দেবতা—মানুষ, এবং ধর্ম্ম—পৌরুষ। ইহার পর, ভারতের আত্মাই যেন শরীরী হইয়া ঐ ভাগীরথীতীরেই অবতরণ করিল, এবং এক মহাবীর্য্যবান আধার সংগ্রহ করিয়া তাহার কর্ণে সেই মন্ত্র দিল, যাহাতে সর্ব্বভয় নিবারণ হয়—সেই মন্ত্র সর্ব্ববন্ধন মোচনের মন্ত্র, অথচ বৈরাগ্যের ত্যাগ-মন্ত্র বা শূন্যবাদ নয়; তাহা স্বাধীন আত্মার স্বাধিকার

ঘোষণার মন্ত্র। জাতির আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য পাশ্চাত্যের নিকট হইতে বঙ্কিমচন্দ্র যজ্ঞের যে সমিধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং ভারতীয়ভাবে শোধন করিয়া তাহাতে যে অগ্ন্যাধান করিয়াছিলেন, সেই অগ্নিতেই স্বামী বিবেকানন্দ নব পুরুষযজ্ঞের মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিলেন। ভারতের সেই প্রাচীন মুক্তি-সাধনাকেই, তিনি ঋষির অরণ্য, যোগীর গুহা, ভক্তের আশ্রম হইতে উদ্ধার করিয়া, জাতি ও সমাজের জীবন-সমস্যার সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন। আহুতিশেষে সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে যে পুরুষের আবির্ভাব হইল, সেই বাণীই যে-মূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহার লৌকিক নাম—নেতাজী সুভাষচন্দ্র। তখনও যজ্ঞশালার বাহিরে সেই মন্ত্র কেহ কর্ণগোচর করে নাই, সেই পুরুষও কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই—অদূর ভবিষ্যৎ তখনও বর্ত্তমান হইয়া উঠে নাই।

সর্ব্বব্যাধি সর্ব্বদুঃখ মোচনের একমন্ত্র যে ঐ স্বাধীনতা, আর কিছুদ্বারা যে তাহা সম্ভব নয়—ঐ এক বস্তুকে লাভ করিতে পারিলে আর সকলই লাভ হইবে, না পারিলে কিছুই হইবে না—ইহা ভারতবর্ষে আর কেহ এমন করিয়া অনুভব করে নাই; এই মন্ত্রের আদি ঋষি বা দ্রষ্টা যে বাঙালী, গত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার, তথা ভারতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। ইহার কারণ কি? কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি; ইংরেজ-সংসর্গের বিষ ও অমৃত দুই-ই সে যে পরিমাণে পান করিয়াছে, এমন আর কেহ করে নাই; শেষে অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষই তাহার আত্মাকে জর্জ্জরিত করিল

—না করিলে, দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে সেই আত্মার এমন প্রকাশ দেখা যাইত না। কিন্তু আরও কারণ আছে; স্বাধীনতাকে বাঙালী যে রূপে ও যে উপায়ে চিরদিন ভোগ করিয়াছে—সে যেন নিঃশ্বাস-বায়ুর মত। এজন্য সে যেমন সে বিষয়ে সচেতন ছিল না, তেমনই তাহার অভাবে, অন্তরের অন্তরে শ্বাস-কষ্ট অনুভব করিয়াছে। সে স্বাধীনতা কেমন? স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের স্বাধীনতা নয়, ধ্বজা তুলিয়া সমারোহ-সহকারে স্বাধীনতা ভোগ করাও নয়; পাখী যেমন আকাশে, মাছ যেমন জলে বিচরণ করে, বাঙালীও তেমনই, রাজা ও রাজধানী হইতে দূরে, নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র জলাশয় বা বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল; জীবনযাত্রার উপকরণ-বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া, সুখ-সম্পদের উচ্চাভিলাষ দমন করিয়া, সে যে-স্বাধীনতা ভোগের আয়োজন করিয়া লইয়াছিল, তাহা তাহার প্রকৃতি ও প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। বাঙালার ইতিহাস এ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই, যাহা হইয়াছে তাহা বাংলাদেশের ইতিহাস—বাঙালীজাতির ইতিহাস নয়। বাঙালীর সেই জাতিগত বৈশিষ্ট্য না বুঝিলে, বাঙালার সাধনা ও সংস্কৃতির সহিত মিলাইয়া না লইলে, সেই প্রকৃত ইতিহাস অজ্ঞাত থাকিয়াই যাইবে। আমি ঐ যে স্বাধীনতার কথা বলিয়াছি—বাঙালীর ইতিহাস সেই স্বাধীনতা, সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষার ইতিহাস। সেই স্বাধীনতা সন্ন্যাসীর স্বাধীনতাও নয়, আবার রাজ্যভোগের স্বাধীনতাও নয়। বাঙালী রাজাও নয়, ফকিরও নয়; তাহার

সাধনায় মধ্যযুগের সেই ভজন-সাধনও যেমন নাই, তেমনই বৌদ্ধ-বেদান্তের শূন্যমার্গও নাই; সেখানে সে তান্ত্রিক, অর্থাৎ, তত্ত্ব ও তথ্য উভয়ের সমান উপাসক। বাঙালী কখনও রাজ্যেশ্বর হইতে চাহে নাই (বাঙালী জাতি হইতে কোন বৃহৎ রাজবংশের উদ্ভব হয় নাই); সে বাণিজ্যের দ্বারা জাতির ধনবৃদ্ধিও করে নাই। তথাপি সে ত্যাগী সন্ন্যাসী নয়, সে ভোগের মধ্যেই বন্ধন-মুক্তির স্বাধীনতা চাহিয়াছে। সে জন্য জীবনকে অতিশয় সহজ ও সরল করিয়া সে সেই শক্তির সাধনা করিয়াছে—যে শক্তি সহজে ও সরলে আনন্দরূপিণী। তাহার সেই স্বাধীনতা দম্ভ বা অভিমানের বস্তু ছিল না, সেই স্বাধীনতার লোভেই সে দারিদ্র্যকে জয় করিয়াছিল, ধনের প্রভুত্ব স্বীকার করে নাই। তাহার ভূমি তাহাকে যে শস্য দেয় তাহার অধিক সে চাহে নাই—কেবল তাহাই সে স্বাধীনভাবে ভোগ করিয়াছে। এই বাঙালীর সহিত ইংরেজের ঘনিষ্ঠতাও যেমন সহজে হইয়াছিল, সংঘর্ষও তেমন দারুণ হইতে বাধ্য। সে তাহাকে ভুলাইয়া তাহার ধর্ম্মনাশ করিয়াছে, তাহার সেই হাজার বৎসরের স্বল্পে-সন্তুষ্ট শান্তিময় জীবনযাত্রা উৎসাদিত করিয়াছে—এমন আঘাত ভারতবর্ষে আর কোথাও সে করে নাই। বাঙালীর রাজ্যপিপাসা ছিল না, ধন-পিপাসাও তাহার স্বাস্থ্য নয়, ব্যাধি—সে ব্যাধিও ইংরেজের সৃষ্টি; তাই আর সকলের সহিত তাহার রফা চলিতে পারে, বাঙালীর সঙ্গে কোন রফা চলিবে না। সে যাহা হারাইয়াছে ভারতের আর কেহ তাহা হারায় নাই; আর সকলে ধন হারাইয়াছে,

বাণিজ্যের মুনাফা হারাইয়াছে, সামাজিক মান বা ইজ্জত হারাইয়াছে; বাঙালী হারাইয়াছে—তাহার শান্তিময় অনাড়ম্বর জীবনের সেই উগ্রতাহীন মাদকতাহীন স্বাধীনতা—তাহার সেই নিঃশ্বাস-বায়ু। ইংরেজও তাহা বুঝিয়াছে—এ জাতিকে সে বিশেষরূপেই জানে, তাই ইহার জন্য তাহাকে একটু বিশেষ ব্যবস্থাও করিতেও হইয়াছে। কংগ্রেসী-ভারতও বাঙালীর এই ধর্ম্মকে বিধর্ম্ম বলিয়াই মনে করে, তাই সে তাহাকে বশ করিতে না পারিয়া অবশেষে বর্জ্জন করিয়াছে।

এই হৃত-স্বাধীনতার বেদনা তাহার মগ্ন-চৈতন্যের মধ্যে গুমরিয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই, বাঙালী ভারতে এক নবধর্ম্মের প্রচারক হইয়াছিল; সেই বেদনা বঙ্কিম-বিবেকানন্দের সাধনায় যে মানসী মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাই নেতাজী সুভাষচন্দ্রে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র কেবল যুদ্ধ-নায়ক নেতা নহেন, ইংরেজের সহিত যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে জয়লাভই তাঁহার সাধনার শেষ ফল নহে, তিনি কেবল শত্রুঞ্জয় নহেন, তিনি আরও অনেক বড়—তিনি নিজে মৃত্যুঞ্জয় হইয়া এই জাতির মৃত্যুভয়হারী; যে বীর্য্যবলে, বিনতানন্দন গরুড়ের মত, স্বর্গ হইতে স্বাধীনতার অমৃত-সোম হরণ করা যায়—তিনি সেই বীর্য্যের অবতার, সেই বীর্য্য ও সেই অমৃত-পিপাসা তিনি আপনার বক্ষ হইতে সমগ্র জাতির বক্ষে সঞ্চারিত করিয়াছেন। তিনি বিবেকানন্দেরই উত্তরসাধক। ইংরেজ সেই স্বাধীনতার সাক্ষাৎ বাধা বটে, এবং সর্ব্বাগ্রে সেই বাধা অপসারিত করিতেই

তিনি তাঁহার সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই যুদ্ধ-জয়কেই যদি আমরা তাঁহার প্রধান বা চূড়ান্ত কীর্ত্তি বলিয়া মনে করি তবে তাঁহার ব্রতকেও যেমন, তেমনই তাঁহার সেই অলৌকিক শক্তিকে আমরা গৌরবহীন করিব। নেতাজী যে মুক্তি চান সে যে কত বড় মুক্তি—সে পিপাসা যে কিসের পিপাসা, তাহা ঐ আজাদ-হিন্দ্-সেনাই বুঝিয়াছে, আমরা বুঝি নাই; যাহারা খাঁটি গান্ধী-পন্থ' তাহারা ত' বুঝিবেই না। তাই নেতাজীর সেই মুক্তি-সাধনের পন্থা লইয়া এত ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার, এত বিতর্ক আমরা করিয়া থাকি। যাহারা সেই স্বাধীনতা—সেই মুক্তিকে অন্তরে প্রত্যক্ষ করে নাই, এবং করিয়া, এই মোহগ্রস্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ অতি-দুর্গত জাতিকে তাহা দিবার জন্য, সেই অপার প্রেম, অপার করুণা অনুভব করে নাই—যে প্রেম সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও তৃপ্তি পায় না, তাহারাই অতি ক্ষুদ্র ধর্ম্মবুদ্ধিকে আশ্রয় না করিয়া পারে না, কারণ তাহাদের আত্মার সেই মুক্তি ঘটে নাই—সে মুক্তি-পিপাসাও নাই। সে যে কত বড় প্রেম—সকল দ্বিধা সকল হিসাব-বুদ্ধি ভস্ম হইয়া যায় বলিয়াই হিংসাতেও যে হিংসাবোধ থাকে না, আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের নরনারী তাহা জানিয়াছে। সেই প্রেমকে তাহারা নেতাজীর রূপে সাক্ষাৎ-দর্শন করিয়াছে, রক্তমাংসের শরীরে তাহার আবির্ভাব দেখিয়াছে। সে এমন দেখা যে, তাহার পর আর কিছু বুঝিতে বা শুনিতে হয় না, তাহারা সকল শোনা ও সকল দেখার—'শ্রুত' ও 'শ্রোতব্যে'র—পারে গিয়াছে; কারণ তাহারা যে

'দেখিয়াছে'! তেমন দেখা কি আর কেহ দেখাইতে পারিয়াছে? যাহারা হিংসা-অহিংসার কথা বলে তাহারা কি ইহাও বুঝে না যে, যুদ্ধ সুভাষচন্দ্রের বৃত্তি বা পেশা নয়—যুদ্ধবিদ্যাই তাঁহার নিকটে পরাবিদ্যা নয়; যিনি কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন, এবার তিনিই নিজে রথী ও সারথি হইয়াছেন—সুভাষচন্দ্রের হৃদ্‌দেশে আসন লইয়াছেন। অথবা, নেতাজীর ঐ যুদ্ধযাত্রা, উহা যেন বুদ্ধের সেই মহাভিনিষ্ক্রমন—অগণিত আর্ত্ত নরনারীর দারুণ দুঃখমোচনের জন্য, ইহাও সেই বোধি-বৃক্ষমূলে মার-বাহিনীর সঙ্গে শাক্য-সিদ্ধার্থের সংগ্রাম; মার-সেনাকে সদলে পরাজিত করিয়া নিজে মুক্ত ও বুদ্ধ হইয়া, তিনি সেই মুক্তি ও সেই বোধি আর সকলকে দিবার অধিকারী হইয়াছেন—ঐ বাহিরের যুদ্ধে যাহারা যোগ দিয়াছিল, তাহারাও অন্তরে মুক্তিলাভ করিয়াছে—তাহারাও মার-সেনাকে পরাস্ত করিয়াছে; সেই মার-সৈন্যগণের নাম—জাতি-অভিমান, ধর্ম্ম-অভিমান, নেতৃত্বাভিমান; কুলগর্ব্ব, পদগর্ব্ব; সর্ব্ববিধ লোভ, ঈর্ষ্যা, দেহসুখ ও মৃত্যুভয়। ইহা যদি হিংসার পথেই হইয়া থাকে, এবং অহিংসার পথে ইহার অন্ধ ও প্রাণহীন অভিনয় মাত্র হইয়া থাকে—তবে কোন্ ধর্ম্ম বড়? হিংসা কাহাকে বলে? অহিংসাই বা কি?

আসল কথা, এ তন্ত্রই ভিন্ন—ইহা গান্ধী-তন্ত্র নয়; ইহার মূলে আছে বিশুদ্ধ মুক্তি-পিপাসা; ইহা শুধুই রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, তাহা অপেক্ষা অনেক বড়, ইহা সেই আত্মারই

বন্ধন-মুক্তি—যুগ-প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় বন্ধন-মুক্তির সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে; ইহা যে কেন বাঙালীর প্রতিভায় ও বাঙালীর সাধনায় সম্ভব হইয়াছে, তাহাও বলিয়াছি। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে এই মুক্তি-পিপাসার আকুলতা, এবং সেই মহাসাধনায় সিদ্ধিলাভের কথা স্মরণ কর। সেই পিপাসার জন্ম হইয়াছিল বাংলার এক অখ্যাত পল্লীতে—রাজা-জমিদারের ঘরে নয়—দরিদ্র-কুটীরে; সেই মূর্ত্তির সেই বেশ স্মরণ কর, অঙ্গে কেবল একখানি কটি-বসন—ঐ বেশ যেমন খাঁটি বাঙালীর বেশ, ঐ মুক্তি-সাধনাও তেমনই বাঙালীরই সাধনা। বাঙালীর প্রতিভাই ভারতীয় সাধনার বিচিত্র ও বহুমুখী প্রয়াসকে আত্মসাৎ করিয়া এবার যে নূতন বাণী ঘোষণা করিল তাহাতে জীব ও ব্রহ্ম, ইহ ও পর, নিজের মোক্ষ ও পরের মুক্তি—আর্থিক ও পারমার্থিকের ভেদ রহিল না; এই মন্ত্রই স্বামী বিবেকানন্দের অপার্থিব মুক্তি-পিপাসাকে পার্থিব মুক্তি-পিপাসার সহিত অভিন্ন করিয়া তুলিয়াছিল—আত্মার বন্ধন ও দেহের বন্ধন দুই-ই যে সমান, এবং দেহের বন্ধন-দশাই অগ্রে মোচন করিতে হইবে, এই মহাবাণী তিনিই ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম বজ্রকণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন।

জাতির মহাদুর্গতির আসন্ন অন্ধকারে এই প্রাণদ মন্ত্রই প্রচারিত হইয়াছিল, তখন কে জানিত তাহার এত প্রয়োজন ছিল। মুক্তি বা মোক্ষ নয়, এই জীবনেই মানুষকে তাহার স্বধর্ম্মে ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবার কামনা এক বাঙালী-

সন্তানকেই বেদান্তের দিব্যাচার হইতে শাক্তের বীরাচারে নামাইয়া আনিয়াছিল। ইহার কারণ আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি—বাঙালীর ইতিহাসে ও তাহার জাতিগত সংস্কারে তাহা নিহিত আছে। যে বস্তু কোন জাতি সত্যই পাইয়াছিল, দীর্ঘকাল ভোগ করিয়াছিল, সে বস্তু যদি সে হারায় তবে তাহার বেদনা যতই প্রচ্ছন্ন হউক, সে কিছুতেই শান্তি পায় না, এবং লগ্ন উপস্থিত হইলেই সেই জাতিগত উৎকণ্ঠা একটা বিবেকানন্দ, একটা সুভাষচন্দ্রে কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ পায়—বায়ুমণ্ডলের অদৃশ্য জলকণা মেঘের আকারে শ্রাবণ-ধারায় বর্ষিতে থাকে। বিবেকানন্দ যাহাকে তত্ত্বরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া, আসন্ন ভবিষ্যতের প্রয়োজনে, চতুর্দ্দিকের মাটিতে বপন করিয়াছিলেন—তাহারই একটি বীজ অনতিবিলম্বে অঙ্কুরিত হইয়া নেতাজী-নামক বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছে।

৫

দেশের দুর্গতিমোচনের প্রয়াস যে উপায়েই হোক, সেই দুর্গতির নিদান সম্বন্ধে অভ্রান্ত দৃষ্টিই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। অভাবটা মূলে কোথায়, কি চাই, ইহাই যদি স্থির করিতে না পারি, তবে উপায় যত বড় উপায় হোক, যত সাধু বা সত্য উপায় হোক—তাহার অর্থ কি? মূল্যই বা কি? লক্ষ্য সম্বন্ধে যদি সত্য-জ্ঞান ও বিশ্বাস না থাকে, তবে একদিন উপায়টাই পরমার্থ হইয়া উঠিতে পারে, উপলক্ষ্যটা লক্ষ্যকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে। গান্ধী-নীতি ও সুভাষ-নীতির মধ্যে কেবল একটা উপায়গত ভেদই আছে, মূলে দুইয়েরই লক্ষ্য এক, কেবল উপায়ের প্রভেদ মাত্র—একটি অহিংসার ও অপরটি হিংসার পথ। এই যে ধারণা, ইহার মত ভুল আর নাই। গান্ধীজী ও নেতাজীর লক্ষ্য এক নয়; একজন চান—যতদূর সম্ভব—দেশের জনগণের দুর্গতি লাঘব, আর একজন চান—মুক্তি। একজন অন্তরের অন্তরে ব্রহ্মবাক্যের মত বিশ্বাস করিয়াছেন যে, এ ব্যাধির যে নিদান তাহাতে ঐ মুক্তি ছাড়া আরোগ্যের আর কোন উপায় নাই, এজন্য মুক্তি আগে—পরে আর সব; আরেকজন তাহা বিশ্বাস করেন না, তাঁহার নিকট মুক্তির চিন্তা আগে নয়, দুর্গতিমোচনটাই আগে; সেই দুর্গতিমোচনের জন্য মুক্তির প্রয়োজন থাকিলেও, তাহা সর্ব্বাগ্রে সম্ভবও নয়, আবশ্যকও নয়

—সে মুক্তি ঐ দুর্গতিমোচনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমিক মাত্রায় লাভ করাই সম্ভব। একজনের বিশ্বাস অপরিসীম, আর একজন সেরূপ বিশ্বাস করিতেও ভয় পান। ইহাই স্বাভাবিক, কারণ একজন বদ্ধ, অপরজন মুক্ত। গান্ধীজীর কারবার অসহায় দুর্গতদের লইয়া—বদ্ধ জীব লইয়া; তাই তাঁহাকে বড় সতর্ক হইয়া, বড় হিসাব করিয়া চলিতে হয়; তিনি মহাত্মা হইলেও মহাপুরুষ নহেন; তিনি কত ভুল করেন, আরও কত করিবেন—মহাত্মার মত তাহা স্বীকার করেন; মহাপুরুষের মত তাহা রোধ করিতে পারেন না। সুভাষচন্দ্র নিজে মুক্ত—নিত্যমুক্ত, তাঁহার সেই মুক্ত-স্বভাবের যে প্রয়াস, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও দ্বিধাহীন,—তাহা experiment নয়; কোনরূপ ফলাফলের উপর তাহার সত্যতা নির্ভর করে না। তাঁহার মনে কোন সংশয় নাই, দৃষ্টি অভ্রান্ত; তাঁহার পথও পৌঁছিবার পথ, আবিষ্কারের পথ নয়; নিজে পৌঁছিয়াছেন বলিয়া তিনি জানেন, কোন পথে সকলকে পৌঁছিতে হইবে। ঐ একজনই সেই দিব্যশক্তি লাভ করিয়াছে, যাহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"।

আজ সারা ভারতে যে নূতন প্রাণের সাড়া পড়িয়াছে—পরিত্রাণের যে ভরসা আবালবৃদ্ধবনিতাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে তাহার কারণ কি? তাহার কারণ, এতদিন কাহারও মোহভঙ্গ হয় নাই, আজ ঐ একজনের হইয়াছে। যদি একজনেরও মোহভঙ্গ হয়, কেবল একজন মুক্ত হয়, তবে তাহার

সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও মুক্ত হইবে—আমাদের বেদান্তদর্শনের এই তত্ত্বটিই যেন আর এক ক্ষেত্রে আর এক অর্থে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে! বেদান্ত বলেন, রাম, কৃষ্ণ, কেহই মুক্ত হন নাই—হইলে সঙ্গে সঙ্গে জগৎ মুক্ত হইয়া যাইত, কারণ ব্রহ্মরূপী সেই এক জীব মুক্ত হইলে—তাহার মোহ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে, সেই স্বপ্নের অন্তর্গত সকল জীবেরই মুক্তি হইবে, সকলেই সেই স্বপ্নদ্রষ্টা ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাইবে। এ তত্ত্ব ঘোর উচ্চাধিকারের তত্ত্ব, ইহা বুঝিবার বা বিশ্বাস করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। কিন্তু আজ এ কি দেখিতেছি! সেই তত্ত্বই নিম্নাধিকারের ভূমিতে, মানবজীবনের জবানীতেই, যেমন সত্য, তেমনই বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছে! এখানে সেই এক জীব—সুভাষচন্দ্র ; একা তাঁহারই মোহভঙ্গ হইয়াছে, তিনিই মুক্তিকে অপরোক্ষ করিয়াছেন, ভারতবর্ষে আর কেহ তেমন করে নাই। কিন্তু তাহারই ফলে আজ একি দৃশ্য! সেই এক মুক্ত-জীবের অপূর্ব্ব উৎসাহ ও উল্লাস শত শত জীবকে বন্ধনমুক্ত করিতেছে—পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করাইতেছে! এ যেন সেই একটি ক্ষুদ্র শলাকা কক্ষব্যাপী অন্ধকার নিমিষে দূর করিয়াছে ; এ যেন সেই এক খ্রীষ্টের আত্ম-বলিদানে সর্ব্বজীবের মুক্তিলাভ! না, বেদান্ত মিথ্যা বলে নাই ; আমরাই ক্ষুদ্র, আমরাই অবোধ, আমাদেরই বিশ্বাস নাই।

এই মোহভঙ্গই সবচেয়ে বড় কথা। আধুনিক ভারতে সুভাষ-চন্দ্র ভিন্ন আর কাহারও যে মোহভঙ্গ হয় নাই, ইহা অতিশয় সত্য কথা। সেই মোহভঙ্গ যে কি তাহা পূর্ব্বে সবিস্তারে বলিয়াছি।

শেষ পর্য্যন্ত, মহত্ত্ব ও শুভবুদ্ধিতে বিশ্বাস কাহারও ঘুচে নাই—তাহার বিরুদ্ধে যত অভিমান ও অভিযানই করিয়া থাকুক, অন্তরের অন্তরে সেই মোহ ছিল, এখনও আছে। আমাদের এই বাংলাদেশের দুই মহামনীষার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা ছাড়িয়া দিই, এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও এ মোহ শেষ পর্য্যন্ত ছিল, কেবল মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তাঁহার সেই মোহ ভাঙ্গিয়াছিল—মৃত্যুশয্যাশায়ী কবির সেই শেষ বাণী সারা ভারতের আর্ত্তনাদের মত দিক্‌দেশ বিদীর্ণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে তিনি সুভাষচন্দ্রের মধ্যে, দেশনায়কের যে মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই শেষবার তিনি তাঁহার ঋষিত্বই প্রমাণ করিয়াছেন।

* * *

গান্ধী-পন্থা ও সুভাষ-পন্থা যে সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহা আজ দেশের বালকেরাও বুঝিয়াছে। সফলতা ও নিষ্ফলতার দ্বারাই যদি এই দুই পন্থা বিচার করিতে হয়, তবে তাহাও কি এতদিনে সুসাধ্য হইয়া উঠে নাই ? নেতাজীর পন্থা কি নিষ্ফল হইয়াছে ? গান্ধীজীর পন্থা কি সফল হইয়াছে ? এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর যাঁহারা ধীরভাবে চিন্তা করিবেন তাঁহারা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, নেতাজীর নিষ্ফলতাও সারাভারতের যে কল্যাণ সাধন করিয়াছে, গান্ধীজীর অধুনা-বিঘোষিত তথাকথিত সফলতা সেই কল্যাণকেও বিপন্ন করিতে চলিয়াছে। গান্ধীজীর নীতি মূলে দ্বৈত-নীতি, তাহাতে সর্ব্বত্র দুইপক্ষ আছে—ভেদকে স্বীকার

করিয়াই রফা বা আপোসই তাহার গৌরব। এই প্রবন্ধে আমি, ইংরেজের যে নীতি ও তাহার যে গূঢ় ও দৃঢ় অভিপ্রায়ের কথা সবিস্তারে বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, গান্ধীজী ও তাঁহার সহচরগণের এই আত্ম-প্রসাদ একটি ঘোরতর আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র; ইংরেজের কূটনীতির নিকটে গান্ধী-নীতি সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়াছে বলিয়াই ঐ আত্মপ্রবঞ্চনা এক্ষণে অতিশয় মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা মূলে গান্ধী-নীতিকে মানিয়া লইয়াছে, অথচ তাহাতেই এমন কতকগুলি গ্রন্থি বা প্যাঁচ লাগাইয়াছে যে তাহাদের নিজেদের নীতিই জয়ী হইয়াছে। তথাপি গান্ধীজী তাহা মানিবেন না, মানিলে তাঁহাকে পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিতে হয়, একরূপ আত্মহত্যা করিতে হয়। যাহারা প্রতিবাদ করিয়াছে, যাহারা প্রকৃত স্বাধীনতা চায় বলিয়া, তাঁহার ঐ আচরণে অতিশয় হতাশ হইয়াছে, তাহাদিগকে ভৎসনা করিয়া তিনি ক্রমাগত যাহা বলিতেছেন তাহা যেমন বিস্ময়কর, তেমনই অর্থপূর্ণ—তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার অন্তরের কামনা কি, এই পঁচিশ বৎসর তিনি ভারতের ভাগ্যকে কোন্ পথে চালনা করিয়াছেন। এমন অনেক উক্তি তিনি কিছুকাল যাবৎ করিতেছেন—তাঁহাকে ভুল বুঝিবার কোন কারণ নাই; তথাপি একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে. ঐ মন্ত্রী-মিশনের ব্যবস্থায় যাহারা খুশী হয় নাই তাহাদিগের উদ্দেশে গান্ধী জী বলিতেছেন—

"Now that there is Congress Raj or representative raj, whether of the Congress variety or the Muslim League, they must set about reforming it in detail and not condemn it in toto." (১৪ই জুলাই-এর সংবাদে 'হরিজন' হইতে উদ্ধৃত)।

অর্থাৎ—"(এই মন্ত্রী-মিশনের ব্যবস্থায়) এইবার যখন জনগণের অনুমোদিত শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন—তাহা কংগ্রেস-মার্কাই হৌক, আর লীগ-মার্কাই হৌক—ঐ ব্যবস্থাকে আদৌ অতিশয় মন্দ বলিয়া পরিহার না করিয়া (অর্থাৎ উহার মূল নীতি স্বীকার করিয়া) যেখানে যেটুকু গলদ আছে তাহারই সংশোধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।"

এই কথাগুলিতে নিশ্চয় কেহ চমকিত হইবেন না; কিন্তু গান্ধীজী যাহা বলেন, তাহা যেমন সরল তেমনই গভীর—ঐ উক্তিটির ভাষ্য করিতে হইলে, তাঁহার আরও অনেক উক্তি, এবং গান্ধী-কংগ্রেসের অনেক পূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত ও কীর্ত্তিকলাপ ইহার সঙ্গে স্মরণ করাইতে হয়। তথাপি ঐ উক্তিটির মধ্যেও সেই এক মনোভাব উঁকি দিতেছে, তাহা এই যে, কংগ্রেস বা লীগ, ভারতের যে অংশে যেই রাজত্ব করুক—শাসননীতি যখন মূলে একই হইয়া দাঁড়াইল, তখন সমগ্র ভারত ত' সেই এক স্বাধীনতা লাভ করিল; বাংলাদেশে লীগের শাসনও যেমন, বিহারে কংগ্রেসের শাসনও তেমনই সেই একই জন-গণ-মন-অনুমোদিত শাসন; মূলে কোন দোষ নাই, গলদ যাহা থাকে তাহা নিজেরাই সংশোধন করিয়া লও; না পার, সে তোমাদেরই অক্ষমতা। ইহাতে ইংরেজের কোন ষড়যন্ত্র নাই, তাহারা ত'

কোথাও রহিল না,—হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, তাহারা ত' ইংরেজ নয়, তাহাদের হাতেই ইংরেজ সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দিয়াছে। ইংরেজের কোন কু-মতলব নাই, এমন কি—

"If the Constituent Assembly fizzles out it will not be because the British are wicked every time ; it will be because we are fools, or shall I say even wicked" (১৪ই জুলাই-এর সংবাদে 'হরিজন' হইতে উদ্ধৃত)।

অর্থাৎ, "গণ-পরিষদ গঠন যদি শেষ পর্য্যন্ত একটা নিষ্ফল চেষ্টায় পরিণত হয়, তাহার কারণ, এই নয় যে, ইংরেজরা প্রতিবারেই দুর্ব্বৃত্তপনা করিতেছে ; বরং আমরাই নির্ব্বোধ, শুধু নির্ব্বোধ নয়, আমরাই দুর্ব্বৃত্ত।"

—ইংরেজের প্রতি এই বিশ্বাস, এবং ইংরেজের ঐ ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইবার কারণ, আশা করি, আর বলিতে হইবে না ; বরং আমি গান্ধী-নীতির যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছি—তাঁহার এই বর্ত্তমান উক্তিগুলি তাহারই সমর্থন করিতেছে। ঐ ব্যবস্থার দ্বারা ভারতের জাতীয়তা ও ঐক্যের মূলে যে কুঠারাঘাত হইল, উহা যে সদ্য-বিষের মত প্রাণহারী—উহার দ্বারা মুসলমানের সহিত প্রীতিস্থাপনও নয়, ইংরেজেরই শাসন-শৃঙ্খলকে আরও দৃঢ় করা হইল—এই অতি সহজ সত্যকে গান্ধীজী গ্রহণ করিবেন না ; তা'র কারণ, তিনি চিরদিন যাহা চাহিয়াছেন এই ব্যবস্থায় তাহার সবটুকু না হইলেও, কিছু পাইয়াছেন—আপাততঃ তাহাই যথেষ্ট। ইংরেজ তাহার রাজ্য ভারতীয়গণের হাতে ছাড়িয়া দিল, অন্ততঃ দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, এবং শীঘ্রই দিবে বা দিতে বাধ্য হইবে, এই মহাত্মা-

সুলভ সরল বিশ্বাসে তিনি তাঁহার কংগ্রেসী-ভারতের দুশ্চিন্তা দূর করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজ আর যাহা হউক, মহাত্মা নয়, সে যে কি করিয়া লইল, তাহা অন্ধেও দেখিতে পাইতেছে। ইংরেজ দেশশাসনের ভার যদি ভারতীয়দিগের হাতে ছাড়িয়াই দেয়, তাহাতেই বা তাহার ক্ষতি কি? রাজ্যশাসন তাহার কখনও উদ্দেশ্য ছিল না, সে চায় লুণ্ঠনের অবাধ অধিকার। আজ যদি শাসনের দিকটা সে ছাড়িয়া দেয়, তবে দেখিতে হইবে, তাহার সেই আসল অধিকারটি সে নিরাপদ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে কি না। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, সেই আসল অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য সে কোন কৌশলই বাকি রাখে নাই। প্রথমতঃ এমন অনৈক্য সৃষ্টি করিয়াছে, যে ভারতবর্ষ কতকগুলি খণ্ডরাজ্যের প্রতিযোগিতায় নিত্য অশান্তিপূর্ণ হইয়া থাকিবে—শান্তিরক্ষার জন্য তাহাকে থাকিতেই হইবে—ব্রিটিশসৈন্য মোতায়েন রাখিবার অজুহাত তাহার থাকিবেই। খণ্ড-রাজ্যগুলিকেও এক একটি বৃহত্তর যুক্তরাষ্ট্ররূপে বাঁধিয়া দিবার উদ্দেশ্য অতিশয় স্পষ্ট, কারণ তাহাতে বিবাদ-বিভেদ আরও গুরুতর আকার ধারণ করিবে, সহজে নিষ্পত্তি হইবে না; বিশেষ করিয়া ঐরূপ দুইটি রাষ্ট্রবিভাগ যেরূপ পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষে যে কখনো শান্তি স্থাপিত হইবে না, ইহা নিশ্চিত। তৃতীয়তঃ যদি বা জনশক্তি কখনও একতাবদ্ধ হইয়া, এই সকল বন্ধন-বেষ্টন ছিন্ন করে, তজ্জন্য দেশের গ্রাসাচ্ছাদন সমস্যাটি সে একটি নূতন অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর

স্থাপন করিয়াছে ; সে এমনই যে, দেশীয় গবর্ণমেণ্ট, কি কেন্দ্রীয়, কি প্রাদেশিক—তাহার কূলকিনারা পাইবে না—কারণ তাহা এখন হইতে একটা আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা বলিয়াই গণ্য হইতেছে। সবচেয়ে বড় কথা, ইংরেজ এখনও তাহার ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করে নাই, ভারতের সহিত ব্রিটেনের সেই Treaty বা চুক্তি, যাহা প্রধানতঃ বাণিজ্যাধিকারসংক্রান্ত—তাহাই এখনও কেহ জানে না। কিন্তু গান্ধাজী সে সকল কথা শুনিবেন না—ইংরেজ ঐ শাসন-কার্য্য ভারতীয়গণের হাতে ছাড়িয়া দিতেছে—ইহাই সবচেয়ে বড় কথা! শিশুকে যেমন কাঠের ঘোড়া দিয়া তাহার অশ্বারোহণ-বাসনা পূর্ণ করিতে হয়—ইংরেজও তাহাই করিতেছে। গান্ধাজী মহাত্মা—এজন্য তাঁহার প্রাণ শিশুর মতই সরল; খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, শিশুরাই ধন্য, কারণ তাহারাই সহজে স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে। গান্ধীজীও গোটা ভারতবর্ষকে সেই স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

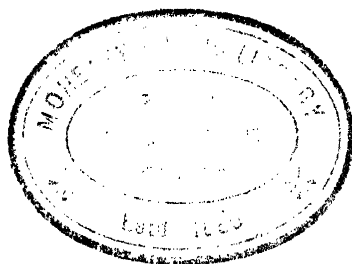
আসল কথা, নেতাজীর দ্বারা যদি ভারতের মুক্তিসাধন না হয়, যদি সেই মহাবীর্য্যবান, মহাপ্রেমিক, মহাপ্রাণ পুরুষ-বীরের আত্মোৎসর্গ আমাদিগকে মুক্তির পথে অগ্রসর না করিয়া থাকে, তবে আমাদের মুক্তির আর কোন আশাই নাই। নেতাজীর পন্থাকে যাহারা কেবল হিংসা বা যুদ্ধের পন্থা বলিয়াই মনে করে তাহারা এখনও তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র বুঝিতে পারে নাই, সে মন্ত্র—"স্বাধীনতা আগে, পরে আর সব।" সেই স্বাধীনতার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, এবং তাহার জন্য সেই প্রেম ও সেই

প্রাণ—একটা অতি প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ,—বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য নেতাজী তাহাকেই একমাত্র উপায় বলিয়া জানেন। গান্ধীজীর প্রেরণা সম্পূর্ণ moral—নেতাজীর প্রেরণা একান্তভাবে spiritual; একটিতে আছে সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনের উপরে ধর্ম্মাধর্ম্মবোধের কঠিন শাসন, আর একটিতে আছে 'বুদ্ধে পরতস্তু য", সেই আত্মার সর্ব্ববন্ধন মুক্তি—অকুণ্ঠিত প্রসার, অসীম স্ফূর্ত্তি। গান্ধীজী ধমক দেন, ভর্ৎসনা করেন; নেতাজী বুকে জড়াইয়া ধরেন। গান্ধীজী বলেন, তোমরা দুর্ব্বল, পাপচিত্ত—আমি করিব কি? নেতাজী বলেন, কোন ভয় নাই, তোমাদের ভিতরে অনন্ত শক্তি আছে; বিশ্বাস কর—আমাকে দেখ, তোমাদের পক্ষেও কিছু অসাধ্য নয়। গান্ধীজী নিয়মিত ভজনের দ্বারা, আত্মশুদ্ধি বা পাপমোচনের উপদেশ দেন; নেতাজী ভগবানের নাম করেন না, মানুষের নামই করেন, তাঁহার ধর্ম্ম—ভগবানকে ভক্তি নয়, মানুষকে প্রেম; সেই প্রেমে পাপের চিন্তামাত্র নাই। নেতাজীর মধ্যে যে শক্তির স্ফুরণ আমরা দেখিয়াছি, তাহা জগতে ক্বচিৎ কখনো দেখা যায়; ভারতবর্ষের ইতিহাসে মনুষ্যভাগ্যের একটি অতিকঠিন সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই, এবং তাহা হইতে এই বিশাল মানবগোষ্ঠীর পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই বলিয়াই, আজ ঐ ঘটনা ঘটিয়াছে;—সমগ্র জাতির ভ্রান্তি ও দুর্ব্বলতা, ভয় ও নিরাশা, ঐ এক পুরুষের অসীম প্রেম ও অনন্ত বিশ্বাসের তাড়িত-শক্তি বলে তিরোহিত হইতে চলিয়াছে; নেতাজীর সেই বিরাট বিশাল

হৃদয়-মুকুরে ভারতবর্ষ আজ তাহার আত্মার প্রতিবিম্ব দেখিয়া উঠিয়া বসিয়াছে—তাহার নবজন্ম হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে, আমি কেবল গান্ধাজী ও নেতাজী দুই জনের দুই মন্ত্র আমার সাধ্যমত বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি; দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন্ মন্ত্র অধিকতর উপযোগী, এবং সেই মন্ত্রে পরিত্রাণের উপায়ই বা কি, সে বিচার আমি করি নাই। উপায় যেমনই হৌক, তাহার মূলে একটা সত্যনীতি থাকা চাই, এবং সত্য এক বই দুই নয়—তাহাতে মাত্রাগত প্রভেদও নাই; উপায় যদি সেই সত্য হইতে ভ্রষ্ট হয়, তবে অনন্তকালেও সিদ্ধিলাভ ঘটিবে না; আমি কেবল সেই সত্যটিকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাতে আমার মত ব্যক্তির পক্ষে অতিরিক্ত দুঃসাহস আছে; অধিকাংশ পাঠকের তাহা শ্রুতিরোচক হইবে না। কারণ, আমি ইহা স্পষ্টই বলিয়াছি যে, গান্ধীজী নিজে সত্যনিষ্ঠ, সত্যাগ্রহী ও আত্ম-বিশ্বাসী হইলেও তাঁহার ঐ নীতি অতিশয় ভ্রান্তনীতি; সেই নীতিরও বহু পরিবর্ত্তন ইতিমধ্যে ঘটিয়াছে। তাহাতে প্রমাণ হয়, তিনি কখনও সাধ্য ও সাধন সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই; তিনি ভারতের ভাগ্য লইয়া, এ পর্য্যন্ত নিজেরই আত্মগত একটি **hypothesis**-এর **experiment** করিয়া চলিয়াছেন। সেই **experiment**-এর যেটুকু সুফল ফলিবার তাহা বহু পূর্ব্বেই ফলিয়াছে; তাহার বেশি হইবে না। হইবারও নয়; কিন্তু তাহাকেই খুব বেশি মূল্য দিয়া, একরূপ

monomania-র বশে, তিনি এখনও যে নেতৃত্বের দাবী করিতেছেন, তাহাতে হিত না হইয়া সমূহ অহিত হইতেই চলিয়াছে। মানুষ ক্রমেই যন্ত্রবৎ—বুদ্ধিহীন ও আবেগহীন হইয়া পড়িতেছে—বিচারের পরিবর্ত্তে অন্ধ-ভক্তিই শরণ্য হইয়া উঠিতেছে; এবং ভণ্ডামী ও মিথ্যাচার অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে। অপর পক্ষে, নেতাজীর মন্ত্র অতিশয় প্রাণদ; এই মন্ত্রে যাহারা দীক্ষিত হইবে, তাহারা উপায়ের জন্য চিন্তা করিবে না—স্বাধীনতার সেই প্রাণময় আকাঙ্ক্ষা যদি তাহাদের হৃদয়ে জাগে, তবে শুধু শক্তি নয়—দিব্যজ্ঞানও লাভ করিবে, উপায় আপনিই দেখা দিবে; কারণ প্রেম কখনও ভুল করে না, প্রেমেই দিব্যজ্ঞান লাভ হয়; নেতাজীকে যদি তাহারা সত্যই অন্তরে পাইয়া থাকে, তবে তাহারা যেমন ভয়ও করিবে না, তেমনই ভুলও করিবে না।



নেতাজী

নাম-স্মরণ

এই প্রবন্ধ যখন লিখিতেছি তখন বাংলার মহানগরী, বাঙালার শতবর্ষব্যাপী সাধনার সাধন-পীঠ, তাহার নবজীবন-যজ্ঞের পুরাতন যজ্ঞশালা এবং অধুনাতন মহাপাপের প্রেতভূমি—কলিকাতা ধ্বংস হইতেছে; কার্থেজ নয়, ট্রয় নয়—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা বিধ্বস্ত লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইতেছে। ১৭৫৭ সালে বাঙালী যে পাপ করিয়াছিল, ১৮৫৭ সালে সে যে-পাপকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল, এবং গত ২৫ বৎসর ধরিয়া যে পাপকে ঢাকিবার চেষ্টায় সে নিজের চরিত্র ও বুদ্ধি দুইয়েরই হত্যাসাধন করিয়াছে, আজ সেই পাপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতেছে। বহু সাধক, বহু মহাত্মা, বহু বার সেই পাপের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রায়শ্চিত্তও করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, আজ তাহার চরমকাল উপস্থিত। বাঁচাইবার কেহ নাই, একটি পুরুষও নাই যাহার মুখের দিকে সে চাহিবে; ক্লীব ও কাপুরুষ, ভণ্ড ও স্বার্থপর প্রবঞ্চকের দল নেতার ভূমিকা অভিনয় করিতেছে, ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া—তাহার যেটুকু ধর্ম্মবোধ ছিল তাহাও হরণ করিয়াছে। এমন দিন বাংলায় আর কখনও আসে নাই। এই নিরন্ধ্র অন্ধকারে, মহামৃত্যুর ঘনায়মান ছায়ায় কেবল একজনকেই

স্মরণ হয়, তাহারই কীর্ত্তি ও তাহার চরিত এই ঘোর নৈরাশ্যকেও কথঞ্চিৎ লঘু করে, মানসনেত্রে সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আত্মা যেন একটু আশ্বস্ত হয়—বলিয়া উঠে, "Sweet Benediction in the eternal Curse!...Thou living form among the Dead!" নিরন্ধ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই আলোক-রশ্মি নির্গত হইতেছে, বিরাট হত্যাশালার আর্ত্ত কোলাহল ক্ষণে ক্ষণে স্তব্ধ করিয়া একটি দূর কণ্ঠের মাভৈঃ রব শোনা যাইতেছে। সেই এক! আর কেহ নাই—কিছু নাই!

বাঙালী, আজ সেই সুভাষচন্দ্রকে স্মরণ কর। পুরাণে আছে, এই দেশেরই শতবেণীসঙ্গমে পবিত্র জাহ্নবীধারাকে দূর গঙ্গোত্তরী হইতে টানিয়া আনিয়া সগররাজবংশের ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল—সেই নির্ব্বংশের একমাত্র বংশধর। পুরাণ ইতিহাস নহে, অর্থাৎ সে কোন বিশেষ কালের বিশেষ ঘটনার কাহিনী নয়; তাহার কাহিনী নিত্যকালের, তাই সেই ঘটনা আজিও ঘটিতেছে। বাঙালীর সগরবংশ ঋষির অভিশাপে ভস্ম হইয়াছে, আজিকার সাগরসঙ্গমে তাহার যে ভস্মরাশি পড়িয়া আছে তাহাকে সঞ্জীবিত করিতে পারে ও করিবে—তাহারই ঐ একমাত্র জীবিত বংশধর; সারাভারতে সে যে পুণ্যপ্রবাহ বহাইয়াছে তাহারই স্পর্শে ঐ ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইবে—ঋষির অভিশাপ হইতে সে মুক্ত হইবে।

সেই মুক্তি হইবে কেমন করিয়া? সে মুক্তিসাধনের মন্ত্র কি? একজন বাঙালীসন্তান জননীজঠরে বাসকালেই সেই

মন্ত্র লাভ করিয়াছিল, তার পর ভূমিষ্ঠ হইয়া, জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে সেই মন্ত্রসাধনের উপায় বা পন্থা খুঁজিয়াছে, স্বপ্নে-জাগরণে এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারে নাই; নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন আকুলভাবে জলের উপরকার বায়ুমণ্ডলে নিঃশ্বাস লইবার চেষ্টা করে, সে তেমনই করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছে। সে যে নিজের মধ্যে মুক্তিকে অপরোক্ষ করিয়াছে, বাহিরেও সেই মুক্তিকে সত্য করিয়া তুলিতে না পারিলে সে বাঁচিবে কেমন করিয়া? তাহার মূর্ত্তিও যেমন, তাহার সেই বাণীও তেমনই উর্জ্জস্বল। তাই এই বৃহৎ কারাগারে বন্ধনই যাহাদের জন্মগত সংস্কার, তাহারা মুক্তিদূতের সেই অদ্ভুত বাণী ও অদ্ভুত আচরণে বিস্ময়-বোধ করিল কিন্তু শ্রদ্ধা করিল না; যাহারা সেই বন্ধন-দশায় কোলাহল সুরু করিয়াছে তাহারা মুগ্ধ হইল, কিন্তু বিশ্বাস করিল না; এবং যাহারা মুক্তিকে বিশ্বাস করে না, যাহাদের মুক্তির ধারণাই অন্যরূপ—অতিশয় ভিন্নপথে মানুষগুলাকে চালনা করিতে পারিয়া যাহারা দলপতিত্বের অভিমানে অন্ধ হইয়াছিল, বণিকের মত অতি-সাবধানী হিসাব-বুদ্ধিই যাহাদের কর্ম্মবুদ্ধি, এবং ভিক্ষাই যাহাদের ধর্ম্ম—তাহারা এই নব পার্থ-সারথির গাণ্ডীবে মুক্তি-মন্ত্রের টঙ্কার শুনিয়া প্রমাদ গণিল, নিজেদের নেতৃত্বনাশভয়ে ভীত হইয়া তাহারা ঐ মুক্তিদূতকে ছলে বলে কৌশলে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার কত চেষ্টাই না করিল! কিন্তু পারিল না। ক্ষুদ্র যেমন মহৎকে পারে না, মিথ্যা যেমন সত্যকে পারে না, মেঘ যেমন সূর্য্যকে পারে না, তেমনই পারিল

না। বরং শেষে তাহারই আশ্রয়ে, তাহারই আবরণে, আপনাদের মহাপরাজয় ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছে, নিজেদের মুখরক্ষা মান-রক্ষার জন্য তাহারই কীর্ত্তি-গৌরবের ছায়ায় আসিয়া সমবেত হইয়াছে। আজ তাহাদের সকল বুদ্ধি সকল কৌশল যখন ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে—দীনতা ও হীনতা, আত্মপ্রবঞ্চনা ও পর-প্রবঞ্চনা যতই বীভৎস হইয়া উঠিতেছে ততই জনগণকে দণ্ড-কৌপীনের মাহাত্ম্য বুঝাইতেছে; মানুষ যখন আসন্ন সর্ব্বনাশের ভয়ে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে তখন তাহাদিগকে পরম-বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেছে! কিন্তু আর কেহ তাহাতে ভুলিবে না; বণিকবৃত্তির দ্বারা সওদা-করা, নির্দ্দিষ্ট ওজনের মুক্তি তাহারা চায় না—জানে, তাহা মুক্তি নয়, বন্ধনেরই একটা নূতন ফাঁদ। ইহাও জানে যে, দেশকে যে ভালবাসে দেশ তাহারই; সেই অধিকার সুভাষচন্দ্রের মত আর কাহারও নাই, অতএব দেশ সুভাষের। সেই দেশের সম্বন্ধে অপরপক্ষের সহিত কোনরূপ বোঝাপড়া করিবার অধিকার আর কাহারও নাই। সুভাষ মরে নাই, তাহার জীবনে কোটী জীবন জাগিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রের সভায় শকুনীর সহিত পাশাখেলার যে ফলাফল তাহাই ভারতের ভাগ্য-মীমাংসা নয়। তাই আজ যখন গান্ধীধর্ম্মী কংগ্রেস একটা মহামিথ্যাকে স্বাধীনতা-নাম দিয়া, সেই স্বাধীনতা সে লাভ করিয়াছে বলিয়া, ধমক ও চীৎকারের দ্বারা সকলকে নিরস্ত করিবার আশা করিতেছে, এবং যখন সেই স্বাধীনতার সম্ভাবনা-মাত্রে চতুর্দ্দিকে শিবা ও সারমেয়গণের চীৎকার, কবন্ধের নৃত্য

প্রভৃতি অশিব ও দুর্নিমিত্ত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন সারাভারত কাহার পুনরাবির্ভাব-প্রত্যাশায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে? মন্দিরে মন্দিরে কাহার মৃত্যুঞ্জয় কামনা করিতেছে? যে কালরাত্রি এই বাংলাদেশে ঘনাইয়া উঠিয়াছে, এ দেশ একটা মহাশ্মশান বা হত্যাশালায় পরিণত হইয়াছে—আজ, শুধু আজ নয়—কালই বা তাহাকে কে বাঁচাইবে? গান্ধী-কংগ্রেস? সে ত' জীবনধর্ম্মকে মানে না; সে বাঁচাইতে পারে না—মরিবার উপদেশ দেয়! তাই বাংলাদেশ আজ কাহাকে স্মরণ করিবে? মশানের শূলাসনে বসিয়াও সে কাহার মুখ মনে করিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও যাতনা ভুলিবে? তাই আজ সে শুধুই সেই এক নাম জপ করিতেছে—নেতাজী, নেতাজী, নেতাজী।

'নেতা' ও 'নেতাজী'

সুভাষচন্দ্রকে এ নাম কে দিল? কোথায় দিয়াছে? কাহারা দিয়াছে? এ নাম কি কেহ দেয়? একি একটি পদবী—একটা খেতাব? ভারতে আজ ৪০।৫০ বৎসর ধরিয়া 'নেতা' নামের কি মাহাত্ম্যই রটিয়াছে! কিন্তু এত 'নেতা' নয় 'নেতাজী'—অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় অবিকল্প অন্বর্থনামা নেতা। এ নাম কেহ তাহাকে দেয় নাই, ঐ নাম লইয়া সে জন্মিয়াছে—বিধাতার স্বহস্ত-অঙ্কিত ঐ নামের তিলক-রেখা সে ললাটে ধারণ করিয়া এই জাতির মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। সে কি নেতা হইবার

জন্য—নেতৃত্ব-গৌরব লাভ করিবার জন্য কখনও অধীর হইয়াছিল—সেই চিন্তা কি সে কখনও করিয়াছে? আজ এই যে সারাদেশ তাহাকে 'নেতাজী' নামে ডাকিয়া নিজেরই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতেছে—ইহাও কি তাহাকে চরিতার্থ করিয়াছে? উহাতেই কি সে পরমপুরুষার্থ লাভ করিয়াছে? যদি নেতাজী নামে তাহাকে ডাকিবার অধিকার আমাদের হইয়া থাকে, তবে এমন চিন্তা যেন আমাদের মনের কোণেও স্থান না পায়—নেতাজী-চরিত্রের সেইটুকুও বুঝিবার 'বুদ্ধিযোগ' যেন আমরা লাভ করি।

ভারতবর্ষে কি আজ নেতার অভাব আছে—নেতার নেতা মহাত্মা গান্ধী নেতৃত্বের তুঙ্গতম শিখরে ভক্তের ভগবানরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার প্রিয় পার্ষদগণ—পাটেল, নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাগোপালাচারী—কেবলমাত্র একটু পদরজের প্রসাদে এক একজন দিকপালরূপে ভারত-ভাগ্য-তরণী চালনা করিতেছেন। সুভাষচন্দ্র 'নেতাজী' হইতে পারেন, কিন্তু তিনি ত 'নেতা' নহেন। নেতা তৈয়ারী হয় ঐ একটি কারখানায়—সেখানকার ছাপ না থাকিলে, কেহই নেতা হইতে পারিবে না। সেই ছাপ যদি থাকে তবে সীতারামায়া, কৃপালনী পর্য্যন্ত কংগ্রেসের যুবরাজ (রাষ্ট্রপতি) হইতে পারে—যদি না থাকে, তবে সুভাষচন্দ্রের মত মানুষও কুকুরের মত বিতাড়িত হয়। না, নেতা কাহাকে বলে তাহা আমরা জানি—নেতার অভাবও আমাদের কখনও হয় নাই—পাটেল আছে, নেহরু আছে, রাজা-

গোপালাচারী আছে, রাজেন্দ্রপ্রসাদ আছে; আর কেহ নেতা হইতে পারে না, পারিবে না। গান্ধীজীর হুকুম নাই। দেখ নাই—কংগ্রেস আবার রাজপাট খুলিয়া বসিয়াছে—পাটে পাটে সেই গান্ধীমার্কা নেতারাই রাজাসনে বসিয়াছে—এমন কি সেই রবিশঙ্কর শুক্লা পর্য্যন্ত! এবার কৃপালনী সেই গদিতে বসিল—যাহাতে বসিতে গিয়া সুভাষ—শুধুই 'গলাধাক্কা নয়'—প্রাণে পর্য্যন্ত মারা যাইতে বসিয়াছিলেন।

অতএব, নেতৃমণ্ডলের একচ্ছত্র প্রভুত্বের—এই নেতার নেতা গান্ধীর রাজ্যে 'নেতাজী' বলিয়া আমরা যাঁহাকে সম্বোধন করিতেছি তাঁহার স্থান কোথায়? সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী নামে ডাকিলে—ঘোরতর সিডিসন হয়—গান্ধীজীর অবমাননা হয়, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়—ইহা সত্য। বাহিরের ভাবভঙ্গি দেখিয়া ভুলিলে চলিবে না, ভিতরে চাহিয়া দেখ। কংগ্রেসী নেতৃমণ্ডল সুভাষচন্দ্রকে কোন চক্ষে দেখে? 'নেতাজী' নাম তাহাদের গলায় বাধে না? জয় হিন্দ্ বলিতে তাহারা কি সত্যই খুশী? সত্যকে চাপা দিয়া, মিথ্যা ভাব-সুখে ভোর হইয়া থাকিলে ধর্ম্মহানি হইবে; একই মুখে 'গান্ধীজী' ও 'নেতাজী' বলা চলিবে না। হয় 'নেতাজী' বল, নয় 'গান্ধীজী' বল,—তাহাতে ত' কোন অপরাধ হয় না; কিন্তু 'নেতা'র সহিত 'নেতাজী'কে এক করিও না; তাহাতে একূল-ওকূল দুই কূলই হারাইবে। মিথ্যার শতরূপ আছে—সত্যের রূপ একটাই; যাহারা সেই বহুকে সেই বিপরীতকেও এক করিয়া লইতে চায়

এবং তাহাকে মনের প্রসার ও উদারতা নাম দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে তাহাদের মত মিথ্যাচারী আর কেহ নয়—তাহাদের আত্মা অলস, সত্যকে তাহারা সহজ করিয়া লইয়াছে, তাহারা ফাঁকি দিয়া বড় হইতে চায়।

আমি বলিয়াছি আজিকার দিনে, আমরা এই যে, 'নেতাজী'র নামে এত উল্লাস প্রকাশ করি, অথচ গান্ধীজীর পদরজ মুখে ও বুকে মাখিয়া ধন্য হই—ইহা শুধুই মোহ নয়, স্পষ্ট দ্বৈতাচার। গান্ধীজীর কোন দোষ নাই—তিনি একদিন স্পষ্ট ভাষায় এবং অতিশয় কঠিন ও নির্ম্মম উপায়ে সুভাষচন্দ্রকে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন; সুভাষ এখনও গান্ধী-ধর্ম্মে সমান পতিত হইয়া আছেন। গান্ধী-চক্রের সেই রূপ, সেই চরিত্র ও সেই ধর্ম্ম এখনও ঠিক তেমনই আছে—তাহার একতিল পরিবর্ত্তন হয় নাই—সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে গান্ধী-কংগ্রেসের উন্মোচিত সেই তরবারি তেমনই শাণিত, তেমনই উদ্যত হইয়া আছে; সেদিন সুভাষচন্দ্র যাহা নিবারণের জন্য আকুল হইয়া নিজের দেহটাকে পর্য্যন্ত গান্ধীজীর রোষহুতাশনে সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, আজ তাহাই অপ্রতিহত প্রতাপে সামাধা হইতে চলিয়াছে—গান্ধী-কংগ্রেস যেন তাহার সেই নীতিকেই জয়ী করিয়া সুভাষ-চন্দ্রের মুখে অতি কঠিন কশাঘাত করিতেছে—সেই মুখে ঝর ঝর করিয়া রক্ত ঝরিতেছে; ত্রিপুরী ও রাজকোটে, দল ও দলপতি মিলিয়া, সেদিন যাহা রক্ষা করিবার জন্য সকল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিল, আজ দিল্লীতে সগৌরবে তাহারই প্রতিষ্ঠা

হইতেছে। তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতাজী কোথায়? ভারতের-একরাষ্ট্র, জাতীয় আত্মমর্য্যাদা ও স্বাধীনতার যে অতিশয় মিথ্যা ও বিকৃত তত্ত্ব এবং ততোধিক মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাকে যাহারা আশ্রয় করিয়াছে তাহাদের এই অপ্রতিহত প্রভাবের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের 'নেতাজী' নামের সার্থকতা কি? কথাটা বুঝিতে হইলে সেই ত্রিপুরার ইতিহাস আবার ভাল করিয়া স্মরণ ও মনন করা প্রয়োজন, কারণ সেই ত্রিপুরী এখন সমগ্র ভারতে তাহার ক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছে, তাহার সেই সুভাষ-দলন এখনও শেষ হয় নাই এবং সম্ভবতঃ শীঘ্র শেষ হইবে না। যতদিন না ভারত স্বাধান হয় ততদিন ঐ ত্রিপুরী-যুদ্ধের বিরাম নাই। এখনও অপর পক্ষই জয়ী—তাই যুদ্ধের স্বরূপ ও তাহার পূর্ব্বাপর কারণপরম্পরা এই প্রসঙ্গে একটু সবিস্তারে বিবৃত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ব-কথা

১৯১৯ সালে গান্ধীজীর উদয় হয়—এক দণ্ড-কৌপীনধারী সন্ন্যাসী ভারতের মুক্তি-সংগ্রামকে অভিনব পথে প্রবর্ত্তিত করিয়া ভারতের আত্মাকেই যেন আশ্বস্ত করিলেন; পথভ্রষ্ট, আত্মভ্রষ্ট ভারতবাসী এক নূতন যুদ্ধাস্ত্র লাভ করিল, দেশের জন্য কারা-বরণ, মৃত্যু-বরণ—ত্যাগ ও বীর্য্যের চূড়ান্ত উৎসাহ, সংগ্রামে সর্ব্বশক্তি নিয়োগের আকুল আকাঙ্ক্ষা, কিছুই বাধা পাইল না, কেবল সেই সংগ্রামের নীতি অতিশয় উচ্চ আধ্যাত্মিক নীতির

আকার ধারণ করিল। ১৯২০।২১ সালে গান্ধীজীর সেই নীতি ও নেতৃত্ব সারা ভারতকে এক নবজীবনের আবেগে স্পন্দিত করিতে লাগিল। গান্ধীজী তখন ধর্ম্মগুরু নহেন, বিশাল সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি—অচির-বিজয়লাভের আশ্বাসদাতা পাঞ্চজন্যধারী জনার্দ্দন! সেই কালে, ভারতের সেই অভিনব জাগরণ-ক্ষণে, একজনের আত্মা যেমন জাগিয়াছিল, তেমন আর কাহারও জাগে নাই। তরুণ সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা-লাভকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিলেন; সে আর স্বপ্ন নহে—অতিশয় বাস্তব-সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। তিনি গান্ধীজীর নীতিতে পূর্ণ আস্থাবান না হইলেও, তাঁহার নেতৃত্বে আশ্বস্ত হইলেন এবং বিরাট জন-জাগরণের—তথা জাতির চৈতন্য সম্পাদনের গুরুরূপে তাঁহাকে বরণ করিলেন; গান্ধী-ধর্ম্ম নয়, গান্ধী-নীতিও নয়,—তিনি গান্ধীজীকে অকপটে বিশ্বাস করিলেন। সুভাষচন্দ্র চান স্বাধীনতা; গান্ধীজী সেই স্বাধীনতালাভের জন্য যুদ্ধ করিবেন, কোনরূপ আপোষ বা রফা তিনি করিবেন না। এই আশা ও বিশ্বাসে সুভাষচন্দ্র বিরজা-হোম করিয়া সেই হোমাগ্নিতে সর্ব্বস্বার্থ আহুতি দিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন—আজিও তিনি গৃহে ফিরেন নাই।

কিন্তু ক্রমেই তাঁহার সেই বিশ্বাস আঘাতের পর আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। গান্ধী-মন্ত্র যে একটি অব্যভিচারী সত্য-মন্ত্র নয়, তাহাতেও সুবিধাবাদ ও কূটকৌশলের স্থান আছে, ইহা ক্রমেই অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। সুভাষ-

চন্দ্রের ভক্তি লঘুচিত্তের ভক্তি নয়; সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর পরবর্ত্তী কীর্ত্তিকলাপে ক্রমিক দুর্ব্বলতা, নিরুপায়ের উপায়-উদ্ভাবন, দ্বৈধ ও সংশয় এবং নৈষ্কর্ম্ম্য বা সংগ্রাম-বিমুখতা লক্ষ্য করিয়াও গান্ধীজীর সততা বা সত্যনিষ্ঠায় আস্থাহীন হন নাই; এমন কি, ত্রিপুরীতে গান্ধী-সৈন্যের ধর্ম্ম ও কর্ম্মের, সেই স্বরূপ প্রকাশিত হইবার পরেও তিনি গান্ধীজীর প্রতি তাঁহার সেই বিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই; যাহারা নিজে মহৎ, তাহারা মহতের অধঃপতনকেও সাময়িক ভ্রান্তি বা পদস্খলন বলিয়াই মনে করে।

১০।১২ বৎসরের মধ্যেই গান্ধী-নীতির আমূল পরিবর্ত্তন হইল। খেলাফতের দারুণ নির্ব্বুদ্ধিতা ও তাহার অন্তর্নিহিত অসত্যই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার শক্তি ও নীতির শুচিতা নষ্ট করিল। ক্রমে খাদি ও চরকাই হইল একমাত্র সংগ্রামকর্ম্ম এবং অহিংসা বা প্রেমের আধ্যাত্মিক তপস্যাই হইল অক্ষমতা ও আত্ম-সংকোচের একটি প্রকৃষ্ট আবরণ। যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া গান্ধীজী নেতার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মগুরুরূপে দেখা দিলেন; কিন্তু তখনও সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈন্য-সজ্জা তেমনই রহিল; পূর্ব্বে সংগ্রাম ছিল সৈন্যও ছিল, কেবল সংগ্রামের নীতিটাই ছিল ভিন্ন—তাহা ছিল একরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ; এখন যুদ্ধ রহিল না, তাহার সেই ধর্ম্মটাই আরও বড় আরও গভীর হইয়া উঠিল। যে জাগরণ হইয়াছিল সংগ্রামের জন্য তখন সেই জাগরণকে একটা অতিশয় আধ্যাত্মিক ধর্ম্মসাধনায় নিয়োজিত করিয়া জনগণকে নিশ্চিন্ত করা হইল।

স্বাধীনতার কোন চিন্তা বা ভাবনা তাহারা করিবে না, তাহারা কেবল ধর্ম্মগুরুর আদেশ পালন করিবে। স্বাধীনতারূপ যে লক্ষ্য তাহার প্রতি দৃষ্টি রক্ষা করারও আবশ্যকতা নাই—সে ভার গুরুর; পাছে সংগ্রামের চিন্তা থাকে, তাই মনকে দমন করিবার জন্য, তাহারা অহিংসার মন্ত্র জপ করিবে এবং হাত-পাগুলাকে শান্ত ও সংযত রাখিবার জন্য স্থির হইয়া চরকা ঘুরাইবে। তাহা হইলেই স্বাধীনতা আপনা-আপনি আসিয়া পড়িবে। কেবল গুরুর আজ্ঞা পালন করিলেই এমন একটি অবস্থার উদ্ভব হইবে যে ইংরেজ ভারত-রাজ্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। উপায় ও লক্ষ্যের মধ্যে বাস্তব সম্পর্ক কি তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর বলিয়াই, গুরুবাক্যে অচল বিশ্বাস রাখা চাই। গান্ধীজী এখন আর নেতা নহেন, তিনি ধর্ম্মগুরু হইয়া জাগ্রত জনগণের সেই স্বাধীনতা-পিপাসাকে, তাহাদের হৃদয়-মনের সেই উৎসাহকে, দেশপ্রেমের সেই অপূর্ব্ব উন্মাদনাকে সাহস-শৌর্য্য ও পুরুষোচিত কর্ম্ম-স্পৃহাকে নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন; কারণ তাঁহার ঐ ধর্ম্মোপদেশের মূল মন্ত্রই হইল—আত্ম-সংবরণ; আত্মসংকোচ বা আত্ম-সম্মোহন। ইহাতে পূর্ব্বের সেই ভাবস্রোত প্রথমে উজানে বহিল, কিন্তু ক্রমেই ধর্ম্মে ও কর্ম্মে, লক্ষ্যে ও উপায়-নির্দ্দেশে যে একটি দুর্ব্বোধ্য আধ্যাত্মিক ব্যবধানকে মানিয়াও অস্বীকার করিতে হইল, তাহাতেই সেই বিরাট বাহিনী ভিতরে ভিতরে বিমূঢ় হইয়া উঠিল; উপরের ঠাট বজায় রহিল, কিন্তু তাহার মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিল; সেই গান্ধীধর্ম্মের বুলি ও বেশ আত্ম-

ভ্রষ্টগণের লজ্জা নিবারণ করিল; কংগ্রেসের তকমা পরিধান করিয়া শঠতা, কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা ও ক্ষমতা-প্রিয়তা প্রভৃতি যাবতীয় পাপ দেশময় সগর্ব্বে বিচরণ করিতে লাগিল। বলাবাহুল্য ক্রমেই স্বাধীনতা গৌণ হইয়া উঠিল, উপলক্ষ্যই লক্ষ্যের স্থান অধিকার করিল।

গান্ধীজীর এই নীতি-পরিবর্ত্তনের আরও কারণ আছে; ভারতের মুক্তি-সংগ্রামকেও গৌণ করিয়া, একটি নবধর্ম্ম-প্রচার এবং এই নবধর্ম্মে জগতের পাপমোচন করিবার, তথা জগৎগুরু হইবার একটা আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় ইতিমধ্যে কোন শুভ বা অশুভ লগ্নে তাঁহার অন্তরে উঁকি দিয়াছিল, তিনি বুদ্ধ ও খ্রীষ্টকেও অতিক্রম করিয়া এই মহামন্বন্তরে মানবজাতির উদ্ধারকর্ত্তা হইবেন, তাঁহার ভিতর হইতে কে যেন তাহাই বলিতেছে! তাই তিনি ভারতের মুক্তি-সংগ্রামকে অহিংসা-যুক্ত করিয়া—তাহাতেই যাহা লাভ হয় তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সকল পার্থিব লাভালাভের উপরে ঐ অহিংসার এক মহোচ্চ বাণীকে জগতজনের চিত্তে দৃঢ় মুদ্রিত করাকেই, তাঁহার প্রধান ব্রত বলিয়া স্থির করিলেন অতঃপর, ভারতবাসীর স্বাধীনতা বা রাষ্ট্রীক পুরুষার্থলাভ যে নিতান্তই ক্ষুদ্র বস্তু, ভারতবাসীকে ঐ অহিংসা-বেদীতলে যূপবদ্ধ পশুর মত কাতারে কাতারে বলি দেওয়া এবং তাহা জগতের হিতার্থে ভারতবাসীর এই আত্মবলিই যে তাহার পরম-পুরুষার্থ-তাহাই নানা ছন্দে নানা ভঙ্গিতে প্রচার করিতে লাগিলেন এই জন্যই তিনি সত্যাগ্রহ-সংগ্রামও ত্যাগ করিলেন; কারণ

লাগাতে 'চৌরিচৌরার' ভয় আছে। তাই তিনি আর যুদ্ধ করিবেন না। কিন্তু অহিংসা-ধর্ম্মে জনগণকে বাঁধিয়া রাখা কত কঠিন তাহা তিনি জানেন—না রাখিতে পারিলে তাঁহার নেতৃত্ব রক্ষা করা দুষ্কর; ঐ নেতৃত্বগৌরব না থাকিলে—ভারতের জনগণের উপরে একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে, জগতের অন্যান্য জাতিগণ তাঁহাকে জগৎগুরু বলিয়া মানিবে কেন? তাই ভারতবাসীর স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাহাদের নেতৃত্ব করিয়া তিনি এককালে এ জাতির যে অতুলনীয় আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও রক্ষা করিবার জন্য ঐ স্বাধীনতার নামটা ত্যাগ করিলেন না; গান্ধী-কংগ্রেস সেই নামটাকে কখনও ছাড়িবে না। যদিও ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা লাভের প্রয়োজন আর নাই, তথাপি চরকাকে সেই যুদ্ধেরই অস্ত্র বলিয়া বারবার ঘোষণা করিতে হইবে, এবং "He (Gandhi) alone can lead us to victory"—এই কলমা সকলকে পাঠ করিতে হইবে; কারণ গান্ধীজী ঈশ্বরের প্রতিনিধি—ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ। যে যুদ্ধ আর নাই—সেই যুদ্ধের নামেই জনগণকে সৈন্যবৎ একতাবদ্ধভাবে গান্ধীজীর আদেশ পালন করিতে হইবে! ঐ গান্ধী-ভক্তির নামই 'Unity and discipline'; কিন্তু তাহা যুদ্ধজয়ের জন্য নহে, যুদ্ধে বিরতি এবং ইংরেজের সঙ্গে চিরসন্ধি-স্থাপনের জন্য; তারপর নির্ব্বিঘ্নে অহিংসার অর্থাৎ আত্মজীবন-নাশের দেশব্যাপী সাধনা। সেই সন্ধিস্থাপনে যে বাধা দিবে, সে যতবড় দেশপ্রেমিক, যতবড় ত্যাগী

এবং যতবড় জ্ঞানী হউক তাহাকে ছলে বলে কৌশলে অপসারিত করিতেই হইবে, কারণ চরকার দ্বারা যে যুদ্ধ তাহাই প্রকৃত যুদ্ধ; এবং "He (Gandhi) alone can lead us to victory" এই ধর্ম্ম ও কার্য্যনীতির যাহারাই বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তাহারাই তদ্দণ্ডে গান্ধী-কংগ্রেসের হাতে রাজনৈতিক মৃত্যুলাভ করিয়াছে।

ত্রিপুরী-তত্ত্ব

সুভাষচন্দ্রের নিকটে ধরা পড়িয়া, ও তাঁহার মত শক্তিমান পুরুষের বিরোধিতায়, গান্ধী-কংগ্রেস ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু সুভাষচন্দ্র অটল, শুধুই অটল নয়—সততায়, সত্যনিষ্ঠায়, সৌজন্যে ও সহিষ্ণুতায়, আদর্শ-বীরের মত তিনি তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। পূর্ব্ব বৎসর হরিপুরা-কংগ্রেসে তিনি রাষ্ট্রপতি হইয়াছিলেন, সেই পদ লাভ করিয়াও তিনি (জবাহরলাল প্রভৃতি সুবোধ বালকের মত) কর্ত্তৃ-মণ্ডলীর বশ্যতা স্বীকার করিলেন না, বরং তাহার পর এক বৎসর ধরিয়া, কংগ্রেসের ভিতরকার সংকল্প সম্বন্ধে দেশবাসীকে উচ্চকণ্ঠে সাবধান করিতে লাগিলেন—ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে রফা করার বিরুদ্ধে উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। ঐ হরিপুরা-কংগ্রেসে তাঁহার প্রণীত, ইংরেজসরকারের সহিত সংগ্রাম-মূলক, একটি প্রস্তাব তিনি পাস করাইয়া লইয়াছিলেন—গান্ধী-চক্র সেজন্য বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে সুভাষচন্দ্র পরবর্ত্তী অধিবেশনে ঐ

ফেডারেশনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য সর্ব্বত্র যে প্রচার-কর্ম্ম করিতেছিলেন তাহাতে ঐ গান্ধী-অধিষ্ঠিত নেতা-কোম্পানী অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। জনার্দ্দন তাহাদের পক্ষে—পক্ষেই বা কেন, জনার্দ্দনই ত সব করিতেছেন ও করাইতেছেন ; সেই জনার্দ্দনের নামে ধার্ম্মিকও ধর্ম্মত্যাগ করিবে, সত্যবাদীরা নীরব থাকিবে, এমন কি বামপন্থীরাও প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস পাইবে না। এদিকে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হইবার জন্য দেশবাসীর সম্মতি চাহিয়াছেন, হইলে রক্ষা নাই—ফেডারেশনের গয়াপ্রাপ্তি হইবে। গান্ধীজী ভিতরে ভিতরে এমন একটি ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়াছেন যাহার মত বীর-ভক্ত আর নাই,—সেই সীতারামায়াকেই রাষ্ট্রপতিরূপে খাড়া করিয়া তাহাদ্বারা অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি হইবে। সুভাষচন্দ্রের নিজে রাষ্ট্রপতি হইবার কোন আকাঙ্ক্ষাই ছিল না ; তিনি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে সেই গুরুতর লগ্নে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন আসন্ন) বিপথে নষ্ট হইতে দিবেন না ; শীঘ্রই যে সমস্যা এবং যে সুযোগ উপস্থিত হইবে তাহার পক্ষে ঐ গান্ধী-নীতি যে কিরূপ ভয়াবহ তাহাই চিন্তা করিয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। গান্ধী-পাদুকাধারী কোনও পুত্তলিকার পরিবর্ত্তে যদি সর্ব্বদলের আস্থাভাজন ও উপযুক্ত কাহাকেও রাষ্ট্রপতিপদে বরণ করা হয় তবে তিনি সানন্দে ঐ পদ-গৌরব ত্যাগ করিবেন, ইহাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন। কিন্তু শোনে কে?—শুনিবেই বা কেন? ব্রিটিশ সরকারের

সহিত রফা করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়, সদ্ভাবও ক্রমে বেশ জমিয়া উঠিতেছে, তরী প্রায় কূলে ভিড়িয়াছে—এমন সময়ে সেই মন্ত্রীত্ব-প্রভৃতির 'বাড়া-ভাতে ছাই ফেলিতে' এ কোন্ মহাশত্রুর আবির্ভাব! এইবার দণ্ড-কৌপীনধারী সন্ন্যাসীরও কৌপীন খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ধর্ম্মযুদ্ধের লাঠিয়ালগণ অতঃপর যে নির্ল্লজ্জ হিংস্রতা ও মোরিয়া-মনোভাবের তাণ্ডব জুড়িয়া দিল, গান্ধী-কংগ্রেসের ইতিহাসকে তাহা চিরদিন কলঙ্কিত করিয়া রাখিবে, ভারত-মহাসাগরের সমুদয় জলরাশি সে কলঙ্ক ক্ষালন করিতে পারিবে না। একদিন এই জাতি যখন মোহমুক্ত হইবে, তখন ঐ একটি ঘটনার বিদ্যুতালোকেই তাহারা গান্ধী-কংগ্রেসের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া দারুণ লজ্জা ও দুঃখ অনুভব করিবে।

ত্রিপুরীতে গান্ধী-সৈন্য সুভাষচন্দ্রকে অপদস্থ ও পরাস্ত করিবার জন্য কি করিয়াছিল, সুভাষচন্দ্রই বা কি অবস্থায় কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়াও সেই রণাঙ্গন ত্যাগ করেন নাই—সে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করিব না। আমি কেবল, সেই সুভাষ-নিধন-যজ্ঞের যিনি যজ্ঞেশ্বর তিনি তখন কি করিতেছিলেন তাহাই একটু স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিব। সুভাষচন্দ্র যখন দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হন, তখন মহাত্মা গান্ধী ভগ্নহৃদয়ের গভীর আক্ষেপ সহকারে বলিয়াছিলেন—"সুভাষচন্দ্রের জয়ে আমারই পরাজয় হইয়াছে"। এই উক্তি-প্রচারের অন্তরালে একটি অতিশয় ন্যায়-বিগর্হিত অভিপ্রায় ছিল; উহার দ্বারা তিনি সকল গান্ধী-

ভক্ত ভারতবাসীকে জানাইতে চাহিয়াছিলেন যে, তিনি এই ব্যাপারে নির্লিপ্ত বা নির্ব্বিকার আছেন মনে করিয়া তাহারা যেন অতঃপর সুভাষের আনুকুল্য না করে। তাহার অর্থ এই যে, (যদিও সুভাষের ঐ জয়লাভে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে,) অধিকাংশ দেশপ্রেমিক কংগ্রেসকর্ম্মীও দেশের সেই সঙ্কটকালে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব কামনা করে, তথাপি গান্ধীজী তাহা সহ্য করিবেন না; জনগণের বুদ্ধি ও বিশ্বাসকে তিনি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা করেন না—তিনি তাহাদের গান্ধীভক্তিকেই দেশভক্তির উপরে উঠাইতে আদেশ দিলেন। রাজনৈতিক মতদ্বৈধের ক্ষেত্রে মানুষের সুস্থ ও স্বাধীন ধর্ম্মবুদ্ধিকে নিষ্ফল করিবার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন—মহাত্মা দূরের কথা—কোন ভদ্রজনেরও উপযুক্ত নয়। কিন্তু গান্ধীজী তখন সত্যই বড় বিচলিত হইয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধিও বিপন্ন হইয়াছিল। ইহার পর, যখন তাঁহার সেই লাঠিয়ালগণ ত্রিপুরীযাত্রা করিল, তখন ঠিক তাহার পূর্ব্বাহ্ণে তিনি তাঁহার সেই ধর্ম্মবুদ্ধিকে অক্ষত রাখিবার জন্য এমন একটি কার্য্য করিলেন যাহার মত বিস্ময়কর আর কিছু হইতে পারে না,—জনগণের চিত্তে এইরূপ বিস্ময় উৎপাদন করিবার শক্তিই তাঁহাকে সর্ব্বজন-বরেণ্য করিয়াছে। তিনি ঠিক সেই সময়ে রাজকোটে প্রস্থান করিয়া তথায় তনুত্যাগের জন্য যোগাসনে বসিলেন। মহাপুরুষগণের লীলা বড়ই রহস্যময়, তাহার মর্ম্ম যেমন সরল তেমনই গভীর। এই যে ত্রিপুরীতে চন্দ্র-গ্রহণ হইবার ঠিক প্রাক্‌কালে তিনি প্রায়োপবেশনে বসিলেন,

ইহা কি তিনি নিজেই স্থির করিয়াছিলেন? তিনি নিজে কিছুই করেন না, ভিতর হইতে আদেশ আসে, সে যে কখন কিভাবে আসে তাহা মনুষ্য-বুদ্ধির অগোচর বলিয়াই ভক্তগণ যেমন বিস্মিত হয়, তেমনই ভক্তির ভারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। দেশটা যে হিন্দুর দেশ! একটি অতিক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণের জন্য এই যে জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করা, ইহার মহিমা তাহারা শীঘ্রই বুঝিতে পারিল। গান্ধীজী কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব অনেক পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা ত' সকলেই জানে; কংগ্রেসের জন্য তিনি কিছুমাত্র চিন্তিত নহেন—সে সময়ে রাজকোটকে না বাঁচাইলে ভারতবর্ষই যে বাঁচে না!

এ দিকে তাঁহার সেই কংগ্রেসী অনুচর—বীরভক্তগণ ত্রিপুরীতে আসিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রে শপথ-বাক্যে প্রচার করিতে লাগিল যে, পরদিন সভার মধ্যে তাহারা যাহা করিবে তাহাতে গান্ধীজীর সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে, এমন কি, তাহারা টেলিফোন-যোগে তাঁহাকে সর্ব্বদা ওয়াকিবহাল রাখিয়াছে। এইরূপ বাক্যের দ্বারা তাহারা সারারাত্রি তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরিয়া সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিগণের ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত করিতে লাগিল; সুভাষচন্দ্রের সেই কঠিন রোগও যে একটা ভাণ মাত্র!—সুভাষচন্দ্রকে কপটাচারী বলিয়া তাঁহার প্রতি সকলের সহানুভূতি নাশ করিবার এমন হীন চেষ্টাতেও তাহারা বিরত হয় নাই!

ত্রিপুরীর অধিবেশনে যাহা হইয়াছিল তাহা এখনও অনেকের

স্মরণ আছে, সেই দলবদ্ধ ক্রূরতা, হিংসা ও মিথ্যাচরণের বিস্তৃত বিবরণে উপস্থিত আমার প্রয়োজন নাই। আমি কেবল দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। সেই কুখ্যাত পন্থ-প্রস্তাবটির সম্বন্ধে গান্ধীজী যে কিছুই জানিতেন না—ঘটনার অনেক পরে তিনি তাহার অনুলিপি দেখিয়াছিলেন, এ কথা তিনি অসঙ্কোচে বলিয়াছেন। অর্থাৎ ত্রিপুরীতে সুভাষ-বধের জন্য তাঁহার প্রাণ-প্রিয় অনুচরগণ যাহা করিয়াছিল তাহার বিন্দু-বিসর্গ তাহারা তাঁহাকে জানিতে দেয় নাই, পাছে জানাইতে পারে বলিয়া তিনি রাজকোটে গিয়া তপস্যায় মগ্ন হইয়াছিলেন! এত বড় একটা সঙ্কটকালে তাহারা গুরুর নিকটে পূর্ব্বে কোন উপদেশ বা মন্ত্রণা গ্রহণ করে নাই! অথচ, "সুভাষের জয়লাভে আমারই পরাজয়" এই উক্তির কারণ এবং পরে ঐ কার্য্য, এই দুইয়ের মধ্যে কোথায় কিরূপ যোগ আছে তাহা ভক্তিমানেরা বুঝিতে চাহিবে না, কিন্তু বুদ্ধিমানেরা না বুঝিয়া ছাড়িবে না। আর একটি কথা এই যে, ঐ ঘটনার পরে সুভাষচন্দ্র যখন গান্ধীজীর সহিত পত্র বিনিময়-কালে তাঁহার ঐ না-জানার কথায় বিস্মিত হইয়া তাঁহার অনুচরগণের সেই আচরণ সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন, তখনও গান্ধীজী তাহাতে নীরব বা বধির হইয়াছিলেন। এত বড় একটা অভিযোগের তদন্তও তিনি করিলেন না, সেই অসত্যবাদী অসাধু অনুচর লইয়াই তিনি ধর্ম্মযুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। সত্য ও অহিংসার এত বড় ঋষি যিনি তিনি এখনও ইহাদিগকেই

বাহন করিয়া, বুকে জড়াইয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাঁহার ধর্ম্মব্রত উদ্‌যাপন করিতেছেন! ত্রিপুরীর পরেও, স্নেহ, দয়া ও উপদেশ-প্রার্থী, রোগশয্যাশায়ী সুভাষের প্রতি তাঁহার ব্যবহার, এবং তাহাকে সম্পূর্ণ একক ও সহায়হীন করিবার জন্য তাঁহার সেই কঠিন ও কঠোর সংকল্প হইতেই বুঝিতে পারা যায়, তিনি ত্রিপুরীর ব্যাপারে কিরূপ নির্লিপ্ত ছিলেন। তবুও গান্ধীজী মহাত্মা, এবং—"These are thy gods, O Israel!"

উপরে ত্রিপুরীর প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি তাহাতে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ওকালতি করা বা তাঁহার পরাজয়ে দুঃখ প্রকাশ করা আমার অভিপ্রায় নয়; সুভাষচন্দ্র যাহা করিয়াছিলেন তাহার ফলাফল বহন করিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। পাঠক-পাঠিকাগণকে আমি কেবল ইহাই ভাবিয়া দেখিতে বলি যে, গান্ধীজীর এই যে একচ্ছত্র নেতৃত্বের অধিকার তাহার প্রধান কারণ কি এই নয় যে, সমগ্র গান্ধী-আন্দোলনের মূলে একটা কঠোর ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি আছে? গান্ধীজী তাঁহার সংগ্রাম হইতে রাজনীতির কূট-কৌশল, অসাধুতা ও শঠতা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া কেবল সত্য ও সততাকেই একমাত্র অস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, দেশের রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহার অসংখ্য ভ্রম-প্রমাদ ও যুক্তিহীন কর্ম্মপদ্ধতিকে—এমন কি, যাহাতে পরাজয় বা সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য তাহাকেও—মানিয়া লইয়াছিলেন; রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে তাঁহার

পারমার্থিক কার্য্য-নীতিও যদি সফল হয়, এই আশায় তাঁহার হাতে ভারতের ভাগ্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখা গেল, সেই সত্য ও সাধুতা তাহাতে নাই, মহাত্মাও লুকাচুরী খেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—কংগ্রেসের সম্মুখভাগে না থাকিয়া তাহার পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া কল-কাঠি নাড়িতে লাগিলেন; সকল দলের ঊর্দ্ধে থাকিয়া, সম্পূর্ণ অপক্ষপাত রক্ষা করিয়া, ভারতীয় জন-মনের ঐক্যবিধায়ক মহাগুরুর ভূমিকা গ্রহণ না করিয়া, তিনি ভিতরে ভিতরে একটি দলগঠন করিয়া লইলেন; মতিলাল, লাজপৎ রায়, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতির লোকান্তর-গমনে তিনি নিঃসপত্ন হইলেন, এবং শেষে একমাত্র উদীয়মান শত্রুকে দমন করিবার জন্য নিজের সেই দলটিকে আরও দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তিনি যখন প্রকাশ্যে সেই দলীয় মনোভাব ঘোষণা করিলেন—তখন হইতে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে গান্ধীজীর ঐ পরমার্থ-নীতির মূল্য আর কি রহিল? তখন হইতে রীতিমত রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিই কি কংগ্রেসের একমাত্র নীতি হইয়া উঠে নাই? মিথ্যাই কি সর্ব্বাঙ্গের ভূষণ হয় নাই? সেই মিথ্যাকে ঢাকিবার জন্যই কি সে আরও উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছে না? কাপুরুষতাকে সে বীর-ধর্ম্ম বলে, বশ্যতামূলক তোষণ কর্ম্মকে সে সংগ্রামশীলতা বা রেভোল্যুশনারি (revolutionary) আখ্যা দান করিয়া থাকে, এবং তাহার ঐ নির্ল্লজ্জ ও উৎকট এক-প্রভুত্বকেও ডিমোক্রেসী বলিয়া জনসাধারণকে বিশ্বাস করিতে বলে। তাহার পরেও উপবাস,

মৌনব্রত, এবং রাম-ভজন প্রভৃতির কোন মূল্য আছে? তখন হইতে প্রকৃষ্ট রাজনীতির দিক দিয়াই গান্ধী-কংগ্রেসের কার্য্যাবলী বিচার করিতে হইবে না? চরকা বা অহিংসার সঙ্গে এই ভিতরকার কর্ম্মনীতি ও অভিপ্রায় সিদ্ধির কোন সম্পর্ক আছে?

ঐ ত্রিপুরীতেই গান্ধী-কংগ্রেস তাহার মুখোস খুলিয়া ফেলিল। সুভাষকে ভারতের রাজনৈতিক রণাঙ্গন হইতে একেবারে বহিষ্কার করিবার জন্য অতঃপর তাহারা যে হিংস্র প্রতিশোধ-পরায়ণতার পরিচয় দিল তাহাতে সুভাষচন্দ্র মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি দেশ-সেবা মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করেন নাই। বরং এই ভাবিয়া আরও অস্থির হইয়াছিলেন যে, ইতিহাসের এক অতিশয় সুমহৎ সন্ধিক্ষণে, স্বাধীনতা-লাভের একটি অপূর্ব্ব সুযোগ ঐ কংগ্রেসের ক্ষুদ্র ও হীন নীতির ফলে ভারত বহুকালের জন্য হারাইবে, বীর্য্য ও বিশ্বাসের অভাবে সে সুনিশ্চিতকেও লাভ করিতে পারিবে না, এবং শেষে অনিবার্য্য ভাবে অধিকতর শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইবে। ইহা তিনি —একমাত্র তিনিই—সেইকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে গান্ধী-কংগ্রেস তাঁহাকে এমনই বিষ-দৃষ্টিতে দেখিল যে, কিছুকালের জন্য ব্রিটিশ প্রতিপক্ষকেও ভুলিয়া গেল—সুভাষ-চন্দ্রকেই নিঃশেষে বিনাশ করিয়া তাঁহার ভস্মরাশি উড়াইয়া দেওয়াই তাহার একমাত্র চিন্তা হইয়া উঠিল। সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করার জন্য বাংলার কংগ্রেসও তাহার বিষদৃষ্টিতে পড়িল

—রামগড় কংগ্রেসে বাংলা হইতে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে এমন নিয়ম করা হইল, যাহাতে বাংলার ভোট সেখানে কোন বাধা সৃষ্টি করিতে না পারে। ইহাও কংগ্রেসের সনাতন-রীতি—প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের যে কঠিন নিয়মাবলী আছে তাহাও গান্ধী-কংগ্রেসের ডিমোক্রেসীকে অতিশয় বিশুদ্ধ বা পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে। তথাপি সুভাষচন্দ্র দমিলেন না, তিনি একাই পথে পথে সকলকে ডাকিয়া ফিরিতে লাগিলেন; ক্রমে সে পথ একলা-চলার পথ হইয়া উঠিল, তখন তিনি বোধ হয় তাঁহার বুকের মধ্যে কেবলই শুনিতেছিলেন—

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে!
একলা চল, একলা চল,
একলা চল রে!
যদি সবাই ফিরে যায়
(ও রে, ও রে ও অভাগা!)

যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে
একলা দল রে!

যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে,

তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বল রে !
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে !'

ত্রিপুরীর পরে ও আজ পর্য্যন্ত

বেশ বুঝিতে পারা যায়, সুভাষচন্দ্র ক্রমেই হস্তপদবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিলেন ; পথ রুদ্ধ হইয়া আসিল, বড় দুয়ারগুলি সব বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তবু সুভাষচন্দ্র স্থির থাকিতে পারেন না। শেষে আর কোন কাজ না পাইয়া, হলওয়েল মনুমেণ্ট-সংক্রান্ত একটা আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহাতেই ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, এবং কারারুদ্ধ হইয়া এমন এক মানসিক অবস্থায় উপনীত হইলেন, যেমন অবস্থা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। তখন তিনি প্রায়োপবেশনের দ্বারা আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করিলেন। বাংলা গভর্ণমেণ্টকে এই সংকল্প জানাইয়া তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, তিনি ঐ কালে দেশের বর্ত্তমান সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, দেশের জন্য কোন সত্যকার কাজ করা অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের ঐ বিরুদ্ধতাই যে তাহার কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জীবনে তিনি যাহাকে সফল করিতে পারিলেন না, মৃত্যুর দ্বারা সেই আদর্শে দেশবাসীকে

উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি ঐরূপ সংকল্প করিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"Life under existing conditions is intolerable for me. . . . In this mortal world everything perishes and will perish—but ideas, ideals and dreams do not. One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in a thousand lives."

[বর্ত্তমান অবস্থায় জীবন-ধারণ আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।.........এ জগতে সকলই বিনাশশীল, কেবল উৎকৃষ্ট তত্ত্ব, উচ্চ আদর্শ ও মহতী কামনা এ সকলের বিনাশ নাই। এইরূপ একটি তত্ত্ব-বিশ্বাসের বশে যদি একজন ব্যক্তিও জীবন বিসর্জ্জন করে, তবে তাহার মৃত্যুতে সহস্র জীবন সেই এক বিশ্বাসে উজ্জীবিত হইয়া উঠিবে]।

উপরের ঐ কথাগুলি আজ আর কাহাকেও বিশ্বাস করাইতে হইবে না। কিন্তু, "বর্ত্তমান অবস্থায় জীবন-ধারণ আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে"—এই "বর্ত্তমান অবস্থা" যে কিরূপ তাহাও আমরা অনুমান করিতে পারি। একদিকে গভর্ণমেণ্ট, অপর দিকে ততোধিক প্রতিহিংসাপরায়ণ পরমাত্মীয়গণ। ইহার পর, সুভাষচন্দ্র যখন তাঁহার সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিলেন, তখন সেই সংবাদে গান্ধী-কংগ্রেসের কিরূপ ভাবোদয় হইয়াছিল? কল্পনা করা কি দুরূহ? সেই পরমাত্মীয়গণ কি দিনের পর দিন টেলিগ্রামের আশায় উদগ্রীব হইয়া ছিল না, কখন সেই মহাশত্রুনিপাতের—চির-নির্ভয়ের—বার্ত্তা সত্য

হইয়া উঠে। সুভাষচন্দ্র কম দুঃখে, কম ধিক্কারে প্রাণত্যাগের সংকল্প করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—"ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও উহাদের মিত্র, তাহার তুলনায় আমিই ঘোরতর শত্রু"। তাঁহার প্রতি গান্ধী-কংগ্রেসের এই আচরণকে তিনি Vendetta-আখ্যা দিয়াছিলেন, এবং তাহা যে "determined, ruthless and vindictive" ইহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধী-চক্রের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না, বাংলা-গভর্ণমেণ্ট তাহাদের অপেক্ষা দয়াধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দিল, তাহারা তাঁহার ঐ প্রায়োপবেশন নিবারণ করিবার জন্য তাঁহাকে কারামুক্ত করিল। ইহার পরে সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করিলেন, নির্ব্বান্ধব ফকিরের বেশে তিনি তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া গেলেন, আর ফিরিলেন না। ফিরিলেন না বটে, কিন্তু উপরি-উদ্ধৃত তাঁহার সেই অমরবাণী মিথ্যা হয় নাই; ভারতের বাহিরেও তিনি তাঁহার সেই Idea বা Ideal-এর জন্য মহাত্যাগের যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই আজ লক্ষ নর-নারীর হৃদয়ে দিব্য দীপশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে।

আর কংগ্রেস কি করিতেছে? তেমনই করিয়া সে বুকে হাঁটিয়া তাহার সরীসৃপ-জীবন সার্থক করিতেছে! প্রাণ নাই, প্রেম নাই, উচ্চ আদর্শ নাই, মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তুলিবার বীর্য্যমন্ত্র নাই,—আছে কেবল ভিক্ষাভাণ্ড, এবং তাহারই গৌরব-বৃদ্ধির জন্য নিরন্তর ধর্ম্মোপদেশের নামে কাপুরুষতার জয়কীর্ত্তন—যাহাদের সংখ্যা এদেশে অত্যধিক, সেই

ক্লীব ও নিৰ্জ্জীব মানুষগুলাকে তাহাদের ক্লীবত্বে উৎসাহ-দান। তাহাতে যাহা লাভ হইয়াছে, এবং হইবে সে বিষয়ে সুভাষচন্দ্র সেইকালেই অব্যর্থ ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিলেন। কংগ্রেস এখনও সেই হীন নীতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করে নাই, সুভাষ-চন্দ্র এখনও তাহার শত্রু, গান্ধী-কংগ্রেস তাঁহাকে সেই যে বর্জ্জন করিয়াছিল এখনও তেমনই করিতেছে; বরং এখন আরও নির্লজ্জ ও নির্ভীকভাবে সমগ্র জাতিকে তেমনই প্রবঞ্চনা করিতেছে; সুভাষচন্দ্র যদি আজ উপস্থিত থাকিতেন, তবে গান্ধী-কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার যেটুকু শ্রদ্ধাও অবশিষ্ট ছিল তাহাও লুপ্ত হইত।

এ প্রসঙ্গ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি বলিতে-ছিলাম—সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' নামে আমরা যে এমন আকুল হইয়া সম্বোধন করি, তাহা কি আমাদের পক্ষেও একটা আত্ম-প্রবঞ্চনা নয়? সেই গান্ধী ও গান্ধী-চক্র এখনও পূর্ণবিক্রমে তাহাদের সেই নেতৃত্বকে—সেই ত্রিপুরী-অভিযানকে—জয়যুক্ত করিতেছে। তাহাতে সুভাষচন্দ্রের নামে গৌরব করিবার কি আছে? সেই প্রেম, সেই ত্যাগ, সেই দিব্যদৃষ্টি ও সেই সত্যনিষ্ঠা যদি এমনই ভাবে ব্যর্থ হয়, তবে সুভাষচন্দ্রের অমর আত্মার যাতনাও কি অমর হইয়া থাকিবে না? সেই অবস্থাতেও যদি আমরা তাঁহাকে 'নেতাজী' বলিয়া সম্বোধন করি তবে তাহা কি সেই পুরুষের পক্ষে একটা মর্ম্মান্তিক পরিহাস নহে? দেশের অধীনতামোচন যে মহাজীবনের একমাত্র সাধনা—যে নেতা না

হইয়া ক্ষুদ্রতম সেবক ভৃত্য হইতেও অসম্মত নয়, যদি দেশ তাহার সেই সেবার দ্বারা স্বাধীন হয়—তাহাকে এই পরাধীন জাতির 'নেতাজী' বলিয়া যতই আমরা সম্মান করি না কেন, তাহাতে সে কি চরিতার্থ হইবে? সে ত' পাটেল-নেহেরু নয়—নেতা হইয়া দেশবাসীর উপর প্রভুত্ব করিবার, ইংরেজ সরকারের নিকটে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা লাভ করিয়া, তাহারই দোসর হইয়া, এই দুঃখী মানুষগুলাকে দমন শাসন করিবার প্রবৃত্তি ত' তাহার নাই। যাহারা দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিবে—সত্য সত্যই সর্ব্বস্বপণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিবে, মান গৌরব প্রতিপত্তি কিছুই আশা বা কামনা করিবে না—সে তাহাদেরই 'নেতাজী', অর্থাৎ—'অগ্রণী'। ইহাই যদি আমরা না বুঝিলাম, তবে তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিয়া তাঁহার অসম্মান করি কেন?

গান্ধী-কংগ্রেস ইতিমধ্যেই সুভাষচন্দ্রের স্মৃতির প্রতিও তাহাদের সেই পুরাতন বৈর-মনোভাব আর ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না। আজাদ-হিন্দ-ফৌজ ও নেতাজীর প্রতি ভারতবাসীর সেই উদ্বেল ভক্তিকে কংগ্রেস একটা দুঃসময়ে বড় কাজে লাগাইয়াছিল, এখন সে প্রয়োজন আর নাই। সে এমন আশাও করিয়াছিল যে, ভারতবাসীর সেই সুভাষ-প্রীতি কংগ্রেস-ভক্তিতেই পরিণত হইবে—গান্ধীর পদতলে উপবিষ্ট ভক্তশিষ্যের মূর্ত্তিতেই সুভাষচন্দ্র পূজা পাইবেন; তাহার জন্য দুই একটা বুদ্ধির কাজও সে করিয়াছিল। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হইবে না দেখিয়া গান্ধী-কংগ্রেস পূর্ব্বের মতই সুভাষের

নামে শঙ্কিত এবং কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। দিল্লীর মসনদে চড়িয়া যে মহাবীর আবুহোসেনের অভিনয় করিতেছেন, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—সুভাষচন্দ্র যে মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছেন, এই অতিশয় সত্য ও শুভ বাণী তিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার কি প্রয়োজন ছিল? সুভাষচন্দ্র না বাঁচিয়াও বাঁচিয়া আছেন—সে বাঁচিয়া-থাকা কি তুমি বোধ করিতে পারিবে? তুমি কি ইহাই বুঝিয়া ভয় পাইয়াছ যে, যতদিন ভারতবাসী জনগণ সুভাষের আশায় পথ চাহিয়া থাকিবে, ততদিন তোমাদেরই বিপদ? কিন্তু তাহারা ঐ মিথ্যা আশা ত্যাগ করে না কেন, তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ? তোমার ঐ কংগ্রেসকে মুখে, এমন কি মনেও যতই তাহারা বিশ্বাস করুক, অন্তরে তাহার উপরে কোন ভরসাই নাই। তোমার কংগ্রেস তাহা বুঝিবে না। জনগণকে ধমক দিয়া, অথবা ধর্ম্মোপদেশের ভাঁওতা দিয়া, এতদিন তাহাদের ইহকাল পরকাল সে নষ্ট করিয়াছে; সে কখনও তাহাদের হৃদয়কে, প্রাণকে গ্রাহ্য করে নাই, বরং তাহাদের সেই হৃদয়কে—মনুষ্য-সুলভ আশা-বিশ্বাস ব্যথা-বেদনাকে—দমন বা উচ্ছেদ করিয়া সে তাহার নেতৃত্বের ধর্ম্ম-ধ্বজা উড়াইয়াছে। সে তাহাকে কি দিয়াছে? দুঃখ দূর করা পরের কথা, সে তাহাকে অসীম দুঃখ ভোগ করাইয়াছে, অসংখ্য কঙ্কালরাশির উপরে তাহার গণপতিত্বের আসন উচ্চ হইতে উচ্চে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মুখের বুলি দিয়া তুমি ত' তাহার বুকের সেই হাহাকার রুদ্ধ

করিতে পারিবে না! তাহারা ঐ মিথ্যা আশা ত্যাগ করিতে পারে না কেন? এক্ষণে ভারতবাসীর মনের অবস্থা—বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'র সেই কুন্দনন্দিনীর মত। যে-পিতা ছাড়া তাহার আর কেহ নাই, সেই পিতার মৃত্যুশিয়রে সে বসিয়া আছে; গভীর রাত্রে জনহীন কক্ষে পিতার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল; তখনও সেই ক্ষীণ দীপালোকে সে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া আছে—পিতার মৃত্যু হইয়াছে এ বিশ্বাস সে কিছুতে করিবে না, কারণ তাহার যে আর কেহ নাই! এমন সর্ব্বনাশ কি হইতে পারে! তাই কুন্দনন্দিনী তাহার মৃত পিতাকেও, যতক্ষণ পারে জীবিত মনে করিয়া সেই মহাভয় দূর করিতে চায়। সুভাষচন্দ্র জীবিত কি মৃত—সে বিশ্বাস ভারতবাসীর পক্ষেও তেমনই; তাহার যে আর কেহ নাই! তুমি হুঙ্কার করিলে কি হইবে?

শুধু তাহাই নয়, আজাদ-হিন্দ সম্পর্কিত অনুষ্ঠান-উৎসব প্রভৃতি কংগ্রেসের চক্ষুশূল হইয়াছে; পাছে প্রভুরা অসন্তুষ্ট হন, তাই যাহারা বিদ্রোহী সুভাষের পক্ষ তাহাদের কার্য্যকলাপ বে-আইনী হইয়া থাকিবে। ত্রিপুরীর পরে সুভাষচন্দ্রের সকল কার্য্যে উহারা এইরূপ হুকুম জারী করিত। তবু এখনও মুখোস সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নাই, এখনও 'জয় হিন্দ' বলিতে বাধ্য হয়, এখনও 'নেতাজী'কে প্রকাশ্যে অস্বীকার করিতে সাহস পায় না।

কংগ্রেসের নীতি ও নেতৃত্ব

নেতাজীর নেতৃত্ব কংগ্রেস কখনও মানে নাই, মানিবে না, মানিতে দিবে না। তাহারা বলে, নেতাজীর পন্থা শুধুই ভুল নয়—উহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। ভুল কি ঠিক তাহাও বড় কথা নয়, আসলে উহা হিংসাকলুষিত; অতএব ঐ পথে ভারতের স্বাধীনতা-লাভ হইলেও তাহা গ্রাহ্য নহে, কারণ সেই স্বাধীনতা-রক্ষাও সংগ্রাম-সাপেক্ষ, অর্থাৎ হিংসামূলক। তাহাতে জগতের উপকার হইবে না, ইতিহাসের ধারা পরিবর্ত্তিত হইবে না—মানব-সমাজে সংগ্রামের অবসান হইবে না, জগতে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এই অতি উচ্চ ধর্ম্ম-ভণ্ডামীর জবাব দিবার অবকাশ এখানে নাই; পৃথিবীর ইতিহাস যাহারা কিছুমাত্র অবগত আছে—সৃষ্টির নিয়ম, মানুষের জীবন, তথা পার্থিব কল্যাণ-অকল্যাণ ও তদ্‌ঘটিত শাশ্বত বিধান যাহারা চিন্তা করিতে পারে, তাহারাই জানে যে, ঐ গান্ধী-ধর্ম্ম-নামক তত্ত্ববাদ যেমন নূতন নহে, তেমনই উহার অন্তর্গত প্রেরণা ও যুক্তি দুই-ই একরূপ দুরারোগ্য ব্যাধির লক্ষণ। এ ব্যাধি ভারতবর্ষে আরও পুরাতন, এবং উহারই বিস্তার ও প্রচ্ছন্ন প্রকোপে ভারতের আজ এই মুমূর্ষু অবস্থা। সে আলোচনা এখানে অবান্তর। আমি কেবল ইহাই বলিতেছি যে, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম যদি মুখ্যত একটি রাজনৈতিক আন্দোলন হয়, অর্থাৎ বিরুদ্ধ রাজশক্তির হস্ত হইতে স্বাধীনতা-উদ্ধারের চেষ্টা হয়, তবে সেই সংগ্রামে কংগ্রেস যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে সত্যকার নেতৃত্ব

গুণের কোন্ পরিচয় আছে? জনগণকে ভক্তিবিমূঢ় করিয়া একরূপ একতাবদ্ধ করা—তাহাদিগকে অবোধ অজ্ঞ শিশুর মত করিয়া রাখা, এবং জনমনের উপরে সেই প্রভাবটাকেই প্রতিপক্ষের আশঙ্কাজনক করিয়া তোলা—ইহার বেশি কিছু সে করিয়াছে? সেই আশঙ্কাবৃদ্ধি ছাড়া সে আর কিছুই করে নাই, করিবার সামর্থ্যও তাহার নাই। প্রতিপক্ষও তাহা জানে, এবং তাহার সেই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে সে সর্ব্ববিধ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছে, এমন করিয়া আট-ঘাট বাঁধিয়া লইয়াছে যে, সেই আশঙ্কাও সে আর করে না, অতিশয় বর্ত্তমানে সেই সত্য আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। আজ গান্ধী-কংগ্রেস যে জয়লাভের গর্ব্ব করিতেছে তাহার মত মিথ্যা, শোকাবহ ও লজ্জাকর কিছু আছে? নেতৃত্বের প্রমাণ কেবল ক্রমাগত কতকগুলা পরীক্ষামূলক কর্ম্মপদ্ধতি-প্রণয়ন করাতেও নয়; অথবা সর্ব্বপ্রকার সংঘর্ষ এড়াইয়া, গা বাঁচাইয়া, কেবল আপোষ-নিষ্পত্তির আশায় বসিয়া থাকা, কিম্বা অভিমান বা বীরত্ব করিয়া জেলে যাওয়াতেও নয়। এ যেন নিথর নিষ্কম্প জলে টোপের পর টোপ ফেলিয়া ছিপ হাতে বসিয়া থাকা; শেষ পর্য্যন্ত একটি পুঁটিমাছ ধরিতে পারিলেও তাহাতেই ধন্য বোধ করা! পাছে সেইরূপ বসিয়া-থাকাকে এবং ঐরূপ পুঁটিমৎস্যকে কেহ শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখে, সেজন্য ক্রমাগত শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ এবং নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ ও ভজন-গানের দ্বারা জনগণকে সম্মোহিত করাই নেতৃত্বের অপর একটি গুরুতর কর্ম্ম। ফলে, স্বাধীনতার নামে একটি মাকাল-ফল

মূল্যবান হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে হইবে। ঐরূপ স্বাধীনতালাভে দেহ ও আত্মাকে প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে তাহা শুনিলে প্রকৃতিস্থ মানুষও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে; কিন্তু যেহেতু গান্ধীজী এ জাতির নাড়ী বহু পূর্ব্বেই ঠাণ্ডা করিয়া ফেলিয়াছেন, তাই কেহ আর চমকিত বা স্তম্ভিত হয় না। ইহার পরে স্বাধীনতার কথাও কেহ মনে আনিবে না,—বড় বড় পণ্ডিতেরা ইতিমধ্যেই গান্ধী-প্রণীত অপূর্ব্ব 'পরিকল্পনা'র ভাষ্য-রচনায় লাগিয়া গিয়াছেন; কারণ, তাহার প্রকৃত অর্থবোধের উপরেই নাকি ভারতের চরম সৌভাগ্য নির্ভর করিতেছে; স্বাধীনতা-লাভ না হইলেও, উহার দ্বারাই চতুর্ব্বর্গ-লাভ হইবে; ব্রিটিশ-রাজশক্তিকে কদলী প্রদর্শন করিয়া আমরা ঐ পরিকল্পনা সফল করিয়া তুলিব; যুদ্ধ করিবার কোন সুযোগই তাহারা পাইবে না—হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিবে; তারপর যখন পরিকল্পনাটির অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইবে, তখন আমাদের সেই স্বর্গলাভ দর্শনে তাহারা হতাশ হইয়া এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইবে। গান্ধীজীর কি অপরাজেয় প্রতিভা!—এমন নহিলে আর নেতা! কিন্তু দেশের অবস্থা এখনই এমন হইয়া উঠিল কেন?—ঐ পরিকল্পনায় ইহার প্রতিষেধ-চিন্তা আছে। বাংলাদেশের যে অবস্থা হইয়াছে, সারা ভারতের আসন্ন অবস্থা তাহা হইতেই অনুমেয়। "ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে", কিন্তু গান্ধীজীর মোহিনীশক্তি এমনই যে, ঘুঁটেও হাসিতেছে!

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। গান্ধী-কংগ্রেসের নীতি ও নেতৃত্ব সেই রামগড়-কংগ্রেসেই—তাহার সেই সুভাষ-বিজয় অধিবেশনে—পরম গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল; দুইটি প্রস্তাবেই তাহার জৌলুসের অবধি রহিল না। প্রথম প্রস্তাবটি এইরূপ—

The Working Committee will continue to explore all means of arriving at an honourable settlement, even though the British Government has banged the door in the face of the Congress.

[ভাবার্থ—দুরন্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদিগের সহিত যতই অসম্মান-সূচক ব্যবহার করুক না কেন (মুখের উপর সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেও) আমরা তাহাদের নিকট হইতে সম্মান আদায় করিবার জন্য শান্তভাবে সর্ব্ববিধ উপায় অন্বেষণ করিব।]

সুভাষচন্দ্র ইহার অর্থ করিয়াছিলেন—"We shall lick the feet of the British Government even though we have been kicked by them"। সুভাষচন্দ্রের কি নিষ্ঠুর অভদ্রতা!

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি আরও আধ্যাত্মিক, আরও সাত্ত্বিকভাবাপন্ন—

The Working Committee desire to make it clear that the true test of preparedness for Civil Disobedience lies in Congressmen themselves spinning and promoting the Cause of Khadi, . . and individual Congressmen seeking an occasion for fraternishing with Harijans as often as

possible, and deeming it their duty to establish harmony between the communities.

[ইংরেজী ভাষার আব্রু খুলিয়া লইলে ইহার রূপটি বড়ই মনোহর হইয়া উঠে, যথা—"সত্যাগ্রহ বড়ই ভীষণ যুদ্ধ, সেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে কংগ্রেসের দৃঢ় আদেশ এই যে, কংগ্রেস-সেনাবৃন্দ অনবরত চরকায় সুতা কাটিবে, এবং সর্ব্বত্র খাদির জয় গাহিবে ; আরও, প্রত্যেক কংগ্রেস-মনুষ্য, দিনের মধ্যে যতবার সম্ভব, হরিজনদের পাড়ায় গিয়া তাহাদের সহিত প্রেমপূর্ণ কোলাকুলি করিবে, পথেঘাটেও ঐরূপ করিবার সুযোগ সন্ধান করিবে ; এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত 'হার-মানা'-(harmony)-সম্বন্ধ স্থাপন করাকে একটি আবশ্যিক ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া গণ্য করিবে ।]

সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন—"A wonderful plea for preparing the Country for direct action.···There is no appeal to one's higher self which can send a thrill through his nerves and steel him for suffering and persecution" অর্থাৎ, "প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত করিবার কি চমৎকার আবেদন !···এ সকলের মধ্যে মানুষের মহত্তর প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিবার কিছুই নাই, যাহাতে তাহার স্নায়ুশিরায় বিদ্যুৎ-চেতনা 'সঞ্চারিত' হয়—চরম নিগ্রহ ও দুঃখকষ্টকে বরণ করিবার জন্য যে লোহার মত কঠিন হইতে পারে, এমন প্রেরণা নাই" ।

ইহা অতিশয় সত্য । মানুষকে জাগাইবার মন্ত্র উহা নয়—উহা ঘুম পাড়াইবার মন্ত্র । ঐ কর্ম্মও মানুষকে যন্ত্রের মত

প্রাণহীন করিয়া তোলে, ঐ প্রেমচর্চ্চাও একটা ভণ্ডামী হইয়া উঠে। শুধু তাহাই নয়, ঐ চরকায়-সূতা-কাটার মত পুরুষের পুরুষত্ব-নাশক মহৌষধ আর নাই, মানুষকে অলস করিবার— এবং সেই হেতু তাহার চিত্তে নানা কুবুদ্ধি উদ্রেক করিবার, এমন উপায় আর নাই। সর্ব্বদা বিপদের মুখে ছুটিয়া যাওয়া, আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়া, অত্যাচার-নিবারণে অস্থির হইয়া উঠা, পরের প্রাণরক্ষার জন্য নিজ-প্রাণ বিপন্ন করিয়া শত্রুর উপরে পতিত হওয়া—এক কথায় দেহ-মন-প্রাণকে সর্ব্বদা একটা উচ্চ ভাব ও উচ্চ লক্ষ্যে নিযুক্ত রাখিলেই মানুষের মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠে, তাহার বক্ষে-বাহুতে সেই বীর্য্য সঞ্চারিত ও সঞ্চিত হয় যাহা বৃহত্তর যুদ্ধে তাহাকে জয়ী করিতে পারে। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সে যদি কেবল চরকায় সূতা কাটে, তবে তাহার মনও ভিতরে ভিতরে যতপ্রকার দুষ্টচিন্তার সূতা কাটিতে থাকিবে, সৎ প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে অসৎ প্রবৃত্তিই জাগিবে (আমি সাধারণ মানুষের কথাই বলিতেছি); সে তখন গান্ধী ও গান্ধী-কংগ্রেসের ভক্ত হইয়া সেই ভক্তির বশে, হয় 'নেতা', নয় 'সম্পাদক', নয় 'রিলিফ কমিটি'র অধ্যক্ষ প্রভৃতি পদ অথবা নানাবিধ ব্যবসায়ে লায়েক হইয়া উঠিবে; ভক্তি যদি আরও গভীর ও নির্জ্জলা হয় তাহা হইলে গো-পালন ও খাদি-বয়নের দ্বারা দেশোদ্ধারের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িবে। গান্ধী-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অতি-চতুর সুবিধাবাদীর দল আজ কি না করিতেছে! আর ঐ

হরিজন-সেবা এবং সাম্প্রদায়িক প্রেম-সাধনা—তাহার দাপটে প্রাণরক্ষা করাই দায় হইয়া উঠিয়াছে।

তথাপি সুভাষচন্দ্র ঐ কংগ্রেসকে কি চক্ষে দেখিতেন, গান্ধীজীকেও তিনি শেষ পর্য্যন্ত কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন, তাহার প্রমাণ, কংগ্রেসের সহিত তাঁহার বিরোধ সত্বেও, প্রতি কথায় ও কাজে দিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন যেমন ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন গান্ধীজীর সহিত সুভাষচন্দ্রের ব্যবহারও তেমনই; এবং কংগ্রেসকে তিনি কোন একটি চক্রের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া মনে করিতেন না বলিয়া, কখনও তাহাকে ত্যাগ করেন নাই। ঐ কংগ্রেস সারা ভারতের সকল স্বাধীনতাকামী জাগ্রত জনগণের প্রতিনিধি, দেশসেবায় যাহার অধিকার আছে কংগ্রেস তাহারই; ঐ কংগ্রেসই নেতৃত্ব করিবে—জনগণের স্বাধীনতা-পিপাসাকে কর্ম্মের ভিতর দিয়া রূপ দিবে; সকল মতবিরোধ সহ্য করিয়া বিরোধের সমন্বয় করিবে; যাহা ন্যায়ধর্ম্ম ও বুদ্ধি-সম্মত—অধিকাংশের স্বাধীন সম্মতিক্রমে (ছলে বলে কৌশলে একটা মেজরিটি খাড়া করিয়া নয়) অতিশয় অপক্ষপাতে তাহাই আচরণ করিবে; এবং সেই সকলের মূলে থাকিবে এক অবিচলিত ও একাগ্র উদ্দেশ্য—পূর্ণ-স্বাধীনতালাভ। এই নেতৃত্ব কংগ্রেসই করিবে। তিনি ত্রিপুরীর পরেও গান্ধীজীর পায়ে ধরিয়া কংগ্রেসের এই ধর্ম্ম বজায় রাখিতে বলিয়াছিলেন; সেই সময়ে গান্ধীজীকে লিখিত তাঁহার পত্রাবলীতেও তাঁহার প্রাণের সেই আকুল কামনা ব্যক্ত হইয়াছে। কংগ্রেসের

সহিত যুদ্ধ করিবার কারণ তিনি নিজেই অন্যত্র এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"The Congress is essentially and fundamentally an organisation which stands for complete independance and the method it has adopted is that of non-co-operation and *Satyagraha.* If a Congressman abandons these essentials and fundamentals he automatically ceases to be a Congressman. And if the Congress tomorrow gives up its fundamental objective and method it will cease to be the Indian National Congress with which we have been familiar since 1920. With the voluntary withdrawal or expulsion from the Congress of the compromise-wallahs the Congress will be restored to its former status, and become once again the revolutionary Organisation that it always should be."

[ভাবার্থ :—অসহযোগ ও সত্যাগ্রহই কংগ্রেসের মূল কর্ম্মনীতি, এবং পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভই তাহার লক্ষ্য। এই নীতি লঙ্ঘন করিয়া যাহারা আপোষ-রফার দ্বারা সেই লক্ষ্যকে ক্ষুণ্ণ করিতে চায় তাহাদিগকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কার করিয়া দিলেই কংগ্রেস তাহার পূর্ব্ব মর্য্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে—সে আবার পূর্ব্বের মতই একটি সংগ্রামশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হইতে পারিবে।]

'নেতাজী' নামের সার্থকতা

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বকামনা কিরূপ এবং কি হেতু, তাহা উপরি-উদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা নেতৃত্বলালসা

নয়—নেতৃত্বের সংশোধন-কামনা। ইহার পর দেশের বাহিরে গিয়া তিনি যে নেতৃত্বগুণের পরিচয় দিয়াছিলেন সে ইতিহাস লিখিবার সময় এখনও হয় নাই—বিক্ষিপ্ত উপাদান এখনও সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয় নাই। তথাপি একটি ঘটনায় তাঁহার নেতৃত্ব প্রতিভার যে পরিচয় নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছে, এখানে কেবল তাহারই উল্লেখ করিব। গান্ধী-কংগ্রেসের নীতিকে তিনি যে শ্রদ্ধা করিতে পারেন নাই তাহার কারণ, ঐ নীতি যে অতিশয় ভ্রান্ত সে সম্বন্ধে ক্রমেই তিনি নিঃসংশয় হইয়াছিলেন। গান্ধীজী প্রথম হইতেই ভারতের হিন্দু-মুসলমান-সমস্যাকে সেই গুরুত্ব দিয়াছিলেন যাহা ব্রিটিশ-সরকারের পক্ষেই অতিশয় সুবিধাজনক; গান্ধী-কংগ্রেস সেই সমস্যাকে ভয় করিয়াই তাহার শক্তি ও দুর্লঙ্ঘ্যতা এমনই বৃদ্ধি করিল যে, অবশেষে তাহাই টর্পেডো-রূপ ধারণ করিয়া কংগ্রেসের সুবৃহৎ রণতরীকে জলমগ্ন করিয়াছে। সুভাষচন্দ্র তাহার ঐ নীতিতে যেমন বিরক্ত তেমনই অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কংগ্রেস সেই সমস্যার সমাধান করিবে আপোস করিয়া,—অথচ একটি দুর্দ্ধর্ষ তৃতীয় পক্ষ তাহাই হইতে দিবে না। আপোস না করিয়াই বা কি করিবে? তাহার যে সেই প্রাণশক্তি নাই, সেই প্রেম—প্রেমের সেই দুর্ব্বার একীকরণ-শক্তি নাই যাহার বলে এই বিরাট ও বহু-বিভক্ত জাতিকে এক মহাজাতিতে পরিণত করা যায়। নাই বলিয়াই সে সর্ব্বদা ভয়ে অস্থির; সে ইংরেজকে ভয় করে, মুসলিম-লীগকে ভয় করে, সুভাষকে ও হিন্দু-মহাসভাকে ভয় করে;

সে জনগণকেও অবিশ্বাস করে। তবু নেতৃত্ব চাই, কাজেই আপোস ভিন্ন উপায় কি? আজ সেই আপোস-নীতির পরিণাম প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—এখন তাহার অবস্থা হইয়াছে—'সাপের ছুঁচো-গেলা'র মত। পাকিস্থান সে কার্য্যতঃ পূরাপূরি মানিয়া লইয়াছে, এবং হিন্দুস্থানেও সে কর্ত্তাদের বাহন হইয়া লাগাম ও চাবুকের আঘাত যতদূর সম্ভব গা-সহা করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে; যদি তাহাও না পারে, তবে এবার সে একূল-ওকূল দুই কূলই হারাইবে। সেই খেলাফৎ-আন্দোলনের সময়েই গান্ধীজী যে দ্বিধা ও দুর্ব্বলতা, এমন কি রাজনৈতিক বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে সেকালের প্রবীণ রাজনীতি-বিদ্, পূর্ব্বতন নেতাগণ, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিরতিশয় শঙ্কিত হইয়াছিলেন; কিন্তু অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের নূতন মন্ত্র এবং তাহার ফলে সেই অভূতপূর্ব্ব জন-জাগরণ তাঁহাদিগকে স্তব্ধ করিয়া দিল—সমস্যা-সমাধান বা আশু পরিত্রাণের কোন উপায় ত' তাঁহারাও নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, জনগণকে চালনা করিবার শক্তিও অর্জ্জন করেন নাই। অতএব সেই নীতির উপরেই নির্ভর করিয়া গান্ধীজী অপ্রতিহত প্রভাবে নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ ভারতের ভাগ্য-তরণীকে সুনিশ্চিত বিনাশের দিকে চালনা করিতে লাগিলেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মুসলিম লীগ যে একটা ভয়ানক বাধা, উহাদের সাহায্য না পাইলে ভারতের ত্রিশ কোটি হিন্দু যে নিতান্তই অসহায়; হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যস্থাপন আগে

পরে স্বাধীনতা-সংগ্রাম ইহাই হইল তাঁহার একমাত্র বুলি। বিলাতের গোল-টেবিল বৈঠকে ইহাই স্বীকার করিয়া তিনি জগতের সমক্ষে ইংরেজের কথারই সমর্থন করিলেন—ঐ বিরোধ-টাই যে ভারতকে স্বাধীনতা-দানের ঘোরতর অন্তরায়, এতবড় সত্যসন্ধ ধার্ম্মিক নেতার মুখে তাহা ব্যক্ত হওয়ায়, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মতলব-সাধন অতিশয় সহজ, এমন কি সততাযুক্ত হইয়া উঠিল। পরে গান্ধীজী ক্রমান্বয়ে এমন সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন যে ঐ বাধা উত্তরোত্তর দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল, এবং উহারই কারণে, শেষে ব্রিটিশ সরকারের হস্তে বিষম পরাজয় স্বীকার করিয়া গান্ধী-কংগ্রেস আজ মরণাপন্ন। গান্ধীজীর নেতৃত্ব ওই একটি বাধাকে জয় করিতে না পারিয়া ক্রমশ অন্তঃশক্তিহীন, অসরল ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। ঐ আপোস-নীতিই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ। যে একচোখ সর্ব্বদা ইংরেজশাসক-সম্প্রদায়ের দিকে পাতিয়া রাখিয়াছে, যে সত্যই পূর্ণ-স্বাধীনতা কামনা করে না, এবং সেইজন্য সর্ব্বস্বপণ করিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে না, যে কেবল একটা দলগত নেতৃত্ব-রক্ষার জন্যই অধীর—জন-জাগরণের পরিবর্ত্তে জনসম্মোহনই যাহার কাম্য, যে একটা অতিশয় বিশিষ্ট ধর্ম্মনীতিকেও আপামর সাধারণের উপরে চাপাইয়া, রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার নামে আধ্যাত্মিক পরাধীনতা—একটা অভিনব ধর্ম্মের শাসন—বিস্তার করিতে চায়, তাহাকে অপর কোন সম্প্রদায় বিশ্বাস করিবে কেন? ইহাও একরূপ exploitation বা লুঠ; এমন করিয়া

মানুষকে জাগানো যায় না—মানুষে মানুষে বিরোধ দূর করিয়া এক বিশাল মুক্ত-স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থাপনাও সম্ভব নয়। তাহা কেমন করিয়া সম্ভব? নেতাজী সুভাষচন্দ্রই তাহা প্রথম হইতে বুঝিয়াছিলেন—কিন্তু ঐ কংগ্রেসকে কিছুতেই বুঝাইতে পারেন নাই—সেই দিব্যদৃষ্টির জন্য যে মহাপ্রাণতার প্রয়োজন তাহা একমাত্র ঐ একটি পুরুষেরই ছিল। তিনি ঐ সমস্যার জন্য কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হন নাই; তিনি জানিতেন যে, ভারতবাসীকে সর্ব্বস্বপণের জন্য আহ্বান করিয়া সংগ্রামে নিযুক্ত করিলেই সকল বিরোধ সকল ভেদ আপনিই মিলাইয়া যাইবে; বদ্ধজলেই রোগ-বীজাণু বৃদ্ধি পায়, প্রবল স্রোত বহাইতে পারিলে সে সকল আপনিই নষ্ট হয়। তিনি বিশ্বাস করিতেন—

"When the bugle is sounded, all those who hunger for freedom will naturally fall in line and resume freedom's march, regardless of their religious faith and denomination. . . . When people become "comrades-in-arms" in the struggle for liberty, a new *espirit d' corps* will develop—and along with it a new outlook, a new perspective, a new vision. . . . It will then be easy for them to solve many of the questions which today appear difficult to solve."

[ভাবার্থ:—যাহারা স্বাধীনতা লাভের জন্য আকুল হইয়াছে, যুদ্ধের ডাক শুনিলেই তাহারা জাতি-ধর্ম্ম-ভেদ ভুলিয়া পরস্পরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে, যুদ্ধযাত্রাকালে সেনাবাহিনীর মধ্যে সকল ব্যবধান লোপ পায়।

…কারণ যাহারা স্বাধীনতা-সংগ্রামে যুদ্ধ-সাথী হয় তাহাদের মধ্যে একটা নূতন ধরণের এক-দেহ-বোধ বা সমপ্রাণতার জন্ম হয়, তাহাদের সকল ধারণা, সকল সংস্কার, সকল আকাঙ্ক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন হয়। তখন, যে সকল সমস্যা আজ এত দুরূহ মনে হইতেছে, সে সকলের সমাধান অতি সহজেই হইয়া যাইবে।]

গান্ধী-কংগ্রেস এই স্বাধীনতার কামনা বা স্বাধীনতা-সংগ্রামকে গৌণ করিয়া চরকা, খাদি ও হরিজন-সেবাকেই মুখ্য করিয়াছে, সে প্রাণশক্তির পরিবর্ত্তে 'ধর্ম্মবুদ্ধি'কে আশ্রয় করিয়াছে।

তারপর সুভাষচন্দ্র বলিতেছেন, স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষাই জাতীয়তা-বোধ সৃষ্টি করে, তখন হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আর থাকে না—"He undoubtedly has a genuine nationalist mentality who wages a war for national freedom."

অতএব—

"Let us not sit with folded hands waiting for the day when the High Command of the Congress and of the Muslim League will bring about a solution of the Communal problem. . . [Those who love freedom and will die for it can solve the Communal problem more easily than anybody else."]

[কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারা কবে এই সমস্যার মীমাংসা করিবেন সেই আশায় আমরা যেন হাতযোড় করিয়া বসিয়া না থাকি।

······যাহারা দেশের জন্য প্রাণ দিবে তাহারাই এ সমস্যার সমাধান করিবে, আর কাহারও সে ক্ষমতা নাই।]

কংগ্রেস ইহা স্বীকার করে নাই—কিন্তু ইহাই যে সত্য, সুভাষচন্দ্র নেতাজী-রূপে তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহাতেই প্রমাণ হয়, সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব-প্রতিভা কত বড়, সে প্রতিভা দৈবী-প্রতিভা, সেই দৃষ্টিও দিব্যদৃষ্টি। কংগ্রেসের সেই নীতি ও তাহার কার্য্যপদ্ধতির পরিণামদৃষ্টে কি ইহাই মনে হয় না যে, সেইকালে যদি সে সুভাষচন্দ্রের হাতে নেতৃত্ব ছাড়িয়া দিত, তবে আজ ভারতের ভাগ্য অন্যরূপ হইত? আসল কথা, কংগ্রেস জনগণকে বিশ্বাস করে নাই, কেবল শাসন করিয়াছে, হুকুম পালন করাইয়াছে; স্বাধীনতালাভ অপেক্ষা নেতৃত্বের নেশাই তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। এই প্রসঙ্গে এক আশ্রম-গুরু সন্ন্যাসীর একটি উক্তি মনে পড়িল, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—ঐরূপ নেতাদের সম্বন্ধে তিনিও বলিতেছেন—

"নেতারা জনসাধারণকে আটকাইয়া রাখে, নিজেদেরই "মানদণ্ড" বজায় রাখিবার জন্য, অবশ্য মুখে তাহাদের বড় বড় আদর্শের কথা বলিতে হয়; নচেৎ লুঠটা নিরাপদ হইবে কেন? জনসাধারণ প্রাণ-প্রধান, তাই চালাকি অনেক সময়ে তাহাদের চোখে ধরাই পড়ে না। তবে প্রাণধর্ম্মী মুক্ত পুরুষ যদি জনসাধারণের মধ্যে প্রাণ লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়েন, তবে প্রাণোপাসক জনসাধারণ তাঁহার সঙ্গে প্রাণসাধনায় যুক্ত হইবে, চালাক নেতৃবৃন্দ তখন ফাঁপরে পড়িয়া জনসাধারণের চরণতলে আসিতে বাধ্য হইবেন। যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, গৌর সকলেই প্রাণপ্রধান জনগণের

সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন” (‘স্বরাজের পূর্ণরূপ’—শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত, পৃঃ ৩১)।

১৩৪৪ সালে অর্থাৎ প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে ঐ কথাগুলি মুদ্রিত হয়, অতএব উহাতে লেখক যে সুভাষচন্দ্রকে স্মরণ করেন নাই তাহা নিশ্চিত; আবার ঐ পুস্তকে তিনি কংগ্রেসের সমালোচনাও করেন নাই, কতকগুলি সাধারণ তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কথাগুলি কি সত্য! ঐ ‘প্রাণধর্ম্মী মুক্ত পুরুষে’র কথাই ত’ আমরাও বলিতেছি। প্রাণ-প্রধান জনগণের ‘নেতা’ নয়—‘নেতাজী’ হইতে আর কে পারিয়াছে? কংগ্রেস জনগণের সহিত পরিচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে প্রাণধর্ম্মী নয় বলিয়া সেই পরিচয় ব্যর্থ হইয়াছে। সুভাষচন্দ্র যেন ইহাই আশঙ্কা করিয়া, আদর্শ-নেতার কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, সে সম্বন্ধে একদা একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমি এই পুস্তকের পরিশিষ্টে তাহার একটি অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। তাহাতে দেখা যাইবে, সুভাষচন্দ্রও কেবল বুদ্ধিকে একমাত্র শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই—জনচিত্তের সহিত গভীরতর যোগ-রক্ষার কথা তিনিও বলিয়াছেন, ইহার জন্য যে instinct বা intuition আবশ্যক, তাহা প্রাণধর্ম্মেরই একটি প্রকৃষ্ট বৃত্তি, একরূপ আধ্যাত্মিক শক্তিও বলা যাইতে পারে। এই শক্তি যে-মানুষের নাই সে জনগণের নেতৃত্ব করিতে পারে না—তাহার সেই নেতৃত্ব সত্য ও কল্যাণকর হয় না। এই প্রবন্ধ অন্য কারণেও মূল্যবান, ইহাতে সুভাষচন্দ্র যেন দর্পণে আপনাকেই দেখিতেছেন, তাই

ইহার নাম দিয়াছেন—'Heart-searching' বা 'আত্ম-পরীক্ষা'। অতএব এই প্রবন্ধে তাঁহার আত্ম-পরিচয় আছে। তিনি যে 'জনগণমন অধিনায়ক' হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, সেই বিশ্বাস তাঁহার হইয়াছে—তাহা যে কত সত্য, আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

শুধু এই উৎকৃষ্ট 'জনগণমনঅধিনায়কতা'র নেতৃপ্রতিভাই নয়—সুভাষচন্দ্রের রাজনীতি-জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি কিরূপ অসামান্য ছিল, তাহারও কিঞ্চিৎ নিদর্শন দিব।

কংগ্রেস অধুনা যে Constituent Assembly বা গণ-পরিষদের নামে মাতিয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাই পরম-পুরুষার্থ বলিয়া ঘোষণাদ্বারা সর্ব্বভারতকে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছে, সেই গণপরিষদের ফন্দিটি তাহার নূতন আবিষ্কার নয়। গান্ধীজী যেদিন হইতে ব্রিটিশ সরকারের সহিত সংগ্রাম পরিহার করিলেন সেইদিন হইতেই আসল বস্তুর নামে ঐ নকল বস্তুর দ্বারা ভারতের পূর্ণস্বাধীনতা বা স্বরাজকে চাপা দিলেন—ভারতের বুদ্ধিমান শিক্ষিত জনগণকেও ঠকাইবার এতবড় কৌশল ইতিপূর্ব্বে কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আজ সেই গণপরিষদই সরকারের সহিত চিরসন্ধি-স্থাপনের প্রধান উপায় হইয়াছে। সত্যকার গণ-পরিষদ যে কি বস্তু, তাহা কখন ও কি অবস্থায় সম্ভব, সে সকল কথা বুঝাইয়া পরে সুভাষচন্দ্র বলিতেছেন—

"But what will happen if the demand is fulfilled by the British Government now? It will be elected on

the basis of separate electorate. The Congress has gone so far as to accept the existing franchise for Legislative Assembly as the basis for electing the Constituent Assembly of their dreams. It will meet under the aegis of the present Imperialist Government. . . . It will be a glorified Debating Society. The floor of the Assembly will become, moreover, the battleground for all the Communal forces of the country. The present Government standing in the background will be in a position to do all the wirepulling that they consider necessary. Unless a miracle happens the squabble within the Assembly will end in a deadlock and the Assembly will prove to be abortive. . . . No, this move is a most dangerous one . . . the Congress will land itself in disaster."

[ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি কংগ্রেসের ঐ দাবী পূরণ করে, তবে সম্প্রদায়হিসাবে পৃথক ভোটের দ্বারা ঐ গণ-পরিষৎ গঠিত হইবে; সেই ভোটাধিকারও অতিশয় নির্দ্দিষ্ট—কংগ্রেস তাহাও মানিয়া লইয়াছে। ঐ গণ-পরিষৎ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ছত্রচ্ছায়ায় মিলিত হইবে। এই সকল কারণে উহা একটি আড়ম্বরপূর্ণ বিতর্ক-সভা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারিবে না। সেখানে দেশের যাবতীয় বিরুদ্ধ দল পরস্পর বিবাদ করিতে থাকিবে, এবং বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট অন্তরালে থাকিয়া আবশ্যক মত তাহাতে সাহায্য করিবে। যদি ইতিমধ্যে কোন অনৈসর্গিক ঘটনা না ঘটে, তবে ভিতরকার ঐ দ্বন্দ্ব-কলহ হইতেই গণ-পরিষদের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি অনিবার্য্য।....ঐরূপ গণ-পরিষৎ ভারতবর্ষের পক্ষে বড়ই বিপদজনক....কংগ্রেসের সর্ব্বনাশ হইবে।]

আজ কি হইতেছে? সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ-বাণী কি সত্য হইয়া উঠে নাই? "The Congress will land itself in disaster"—তাহার কি বাকি আছে? অদ্য তারিখে (২২।১১।৪৬) যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, পণ্ডিতজীও আর পারিতেছেন না, যদিও গণ-পরিষৎ গঠন করা অসম্ভব হইয়াছে, তথাপি তিনি একরূপ মোরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। এদিকে গান্ধীজী তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির চূড়ান্ত পরিচয় দিতেছেন—নোয়াখালির সেই শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন অরণ্যে তিনি একাই অহিংসার স্বর্গীয় শক্তি পরীক্ষা করিতে প্রবেশ করিয়াছেন। এবার অবস্থা সাংঘাতিক, তিনিও হয়ত' তাহা বুঝিয়াছেন, এখন ঐ ভাবে একটা কিছু করা ছাড়া আর কোন উপায় যে নাই! তিনি এখনও, একাই পৃথিবীতে সত্যযুগ আনিবার সংকল্প ত্যাগ করেন নাই—মানুষ যে তাঁহার ঐ ধর্ম্মমন্ত্রের প্রভাবে দেবতা হইয়া উঠিবে না, ইহা তিনি কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। না করুন, তাঁহার ঐ ধর্ম্মোন্মাদপ্রসূত মস্তিষ্কবিকৃতির জন্য একটা জাতির কি দুর্গতিই না হইল! আজ তিনি যদি তাঁহার সেই অদ্ভুত খেয়ালকে সত্যে পরিণত করিতে না পারিয়া তেমনই অন্ধ বিশ্বাসের বশে একটা কিছু করিয়া বসেন, তাহাতেই বা দেশের কি উপকার হইবে? কংগ্রেস এতকাল ধরিয়া, আত্মবুদ্ধির অতিরিক্ত অভিমানে ও নেতৃত্বের নেশায়, জাতির যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহার কোন প্রতিকার আছে? সুভাষচন্দ্র ইহাই

নিবারণ করিতে চাহিয়াছিলেন—ঐ গান্ধীচক্রের নেতৃত্ব যে কিরূপ বিপদ-জনক, তাহা বুঝিতে পারিয়া তিনি দেশের ঠিক এই ভবিষ্যৎকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; তাই স্থির থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু কংগ্রেস অতিশয় সহজ ও সুখকর পন্থায় ভারত-উদ্ধার করিবে বলিয়া তাঁহার সেই পরামর্শ গ্রহণ করে নাই, উপরন্তু বিদ্রোহী বলিয়া তাঁহাকে গুরুতর শাস্তিদান করিয়াছিল।

ইহার পরেও কি সুভাষচন্দ্রকে, অবিশ্বাসী, উন্মাদ, দেশদ্রোহী বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে? সুভাষচন্দ্র যে স্বমত-অন্ধ, নেতৃত্বলোভী একজন সাধারণ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র ছিলেন না, পরন্তু তাঁহার মত চিন্তাশীল, তীক্ষ্ণধী ও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন জননায়ক আধুনিক ভারতে আর দেখা যায় নাই, তাহার অসংখ্য প্রমাণ তাঁহার চরিত্রে, চিন্তায় ও কার্য্যাবলীতে পাওয়া যাইবে। আমি এই পুস্তকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের যেটুকু পরিচয় দিতে পারিয়াছি তাহাতে আশা করি, ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ইদানীন্তন কালে যদি কোন প্রকৃত নেতৃগুণসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তবে সে পুরুষ সুভাষচন্দ্র। শুধু তাহাই নয়, এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস যখন লিখিত হইবে, তখন সেই ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক নিশ্চয় ইহা লক্ষ্য করিবেন যে, সেই যুদ্ধে জয়লাভের যে একটি মহাসুযোগ আসিয়াছিল তাহা অতিশয় শোচনীয়রূপে ব্যর্থ করিয়াছিল

তাহারাই—যাহারা সেই লগ্নে সুভাষচন্দ্রকে দেশত্যাগী করিয়াছিল। সেই সংগ্রামের একটা দীর্ঘ অধ্যায় প্রায় শেষ হইয়াছে, কংগ্রেস—গান্ধী-কংগ্রেস—এক্ষণে প্রায় পরাজিত বা পতনোন্মুখ, দেশব্যাপী হিংসা-হানাহানি ও পৈশাচিক তাণ্ডবের মধ্যে তাহার সেই অহিংসা ও আপোস-নীতির সমাধি হইতেছে; ইহার পর জনসমুদ্রে ব্যর্থশ্বাসের যে তুমুল ঝড় উঠিবে, তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে কে? নেতাজীর মত পুরুষ একই যুগে একই জাতির মধ্যে কয়বার আবির্ভূত হয়? "তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে"।

নেতাজী-চরিত—উপসংহার

এইবার আমি, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে মানবাত্মার যে অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখিয়াছি, তাহারই আরতি ও অর্চ্চনা করিয়া এই প্রবন্ধের, তথা গ্রন্থের উপসংহার করিব। পাঠক-পাঠিকাকেও আমি সেই মূর্ত্তি ও সেই চরিত্রের প্রতি গভীরতর দৃষ্টিপাত করিতে বলি। এই গ্রন্থে, আমি যেখানে যত অপ্রিয় সত্যভাষণের পাপ করিয়াছি—লোকপূজ্য ব্যক্তি ও জন-বরেণ্য নেতার বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিয়াছি, এবং সেই সমালোচনাতেও—মানুষ আমি—যে সকল তথ্য বা তত্ত্বের ভ্রম করিয়াছি, সেই সকল পাপই, এক্ষণে নেতাজী-চরিতের পাবনী-ধারায় স্নান করিয়া ক্ষালন করিতে পারিব। এখন আর কংগ্রেস নয়, জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম নয়, এমন কি, আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের

অলৌকিক কীর্ত্তি-কাহিনীও নয়, এখন কেবল সেই পুরুষের প্রতি চাহিব, তাঁহার মহনীয় চরিত্র ও মহত্তর আত্মার অমর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিব। পৃথিবীর ইতিহাসে কত বড় বড় পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে—মানবাত্মার কত বিভূতিই প্রকাশ পাইয়াছে! কেহ ধর্ম্মে, কেহ রাষ্ট্রে, কেহ শিল্পে, কেহ সাহিত্যে, কেহ রণাঙ্গনে, কেহ মানুষের চিন্তারাজ্যে—মানবীয় প্রতিভার, মানব-মহত্ত্বের বিজয়-কেতন উড্ডীন করিয়া এখনও ইতিহাসের ধারায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে এক একটি শক্তির বিকাশ আমরা দেখিয়াছি—সকলের মধ্যে সকল শক্তির বিকাশ দেখি নাই। এইজন্যই, ভারতবর্ষে যাঁহাদিগকে অবতার-কল্প পুরুষ বলা হয়—সেইরূপ পুরুষগণের মধ্যেও, মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে' তিনি সে-পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি ও চিন্তার সমাবেশ করিয়াছেন। আমি অবশ্য সুভাষচন্দ্রের জন্য সেইরূপ গৌরব দাবী করিতেছি না; অবতার বা মানব-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা যে সকল মহাপুরুষ পৃথিবীতে চিরপূজ্য হইয়া আছেন, তাঁহাদের মহিমা যেমনই হৌক, তাঁহারা সাধারণ মানব-চরিত্র নহেন—একটু ঊর্দ্ধস্তরের আত্মা। সুভাষচন্দ্রের চরিত্র সাধারণ না হইলেও, তাহার মহত্ত্ব—মানবতায়। ভারত-ইতিহাসের এক অতিশয় সঙ্কট-লগ্নে তিনি যেন বিধাতাকর্ত্তৃক একটি কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, আমরাও প্রধানতঃ সেই কর্ম্মের ভিতর দিয়াই তাঁহার পরিচয় পাই। কিন্তু

মানুষ-সুভাষচন্দ্র যে সেই নেতাজী-নামধারী সুভাষচন্দ্র হইতে ক বড়, ইহাই যদি আমরা বুঝিতে না পারিলাম, তবে মানবাত্মার একটা বড় প্রকাশকেই আমরা দেখিলাম না। তাই ক্ষণেকের জন্য তাঁহার সেই বাহিরের বেশ, যত কিছু বাহিরের সম্পর্ক—গান্ধী, কংগ্রেস, ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট ও আজাদ-হিন্দ্—সব দূরে সরাইয়া, আমরা সুভাষ-নামধারী সেই মহাত্যাগী ও মহাপ্রেমিক, আত্মশক্তিমান ও মহাবীর্য্যবান পুরুষশ্রেষ্ঠকেই চিনিয়া লইব চিনিবার উপায়ও আছে।

মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় প্রেমে—এই প্রেম যত বড়, মানুষও তত বড়। সুভাষচন্দ্রের দেশ-প্রেম—তাহার কি তুলনা আছে? তেমন প্রেম পৃথিবীর ইতিহাসে আর কাহারও মধ্যে ঠিক সেই মাত্রায় ও সেই রূপে প্রকাশ পাইয়াছে? এ প্রেম—আত্মার আত্মোৎসর্গের যে আনন্দ, সেই আনন্দ-পিপাসা। স্বামী বিবেকানন্দ ইহাকে জ্ঞানে পাইয়া কর্ম্মে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, সুভাষচন্দ্র ইহাকে জ্ঞানে নয়, ধ্যানেও নয়—তাঁহার নিঃশ্বাসবায়ুরূপে পাইয়াছিলেন। এই প্রেম ভাব-সাধনার প্রেম নয়—ইহা বৈষ্ণবের বৃন্দাবনবিলাস নয়, নিজ-মানসের নিভৃত নিকুঞ্জে ভাব-সম্মিলনের গোপন প্রীতিরস-ভুঞ্জন নয়। এ প্রেম শক্তিমান শাক্তের প্রেম, ইহার প্রীতি-মন্দাকিনী নিষ্কলুষ কর্ম্মধারায় অহরহ বেগবান; ইহা আপনার মধ্যে আপনি আত্ম-মুগ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না—শক্তির জগতে নিজেকে প্রসারিত করিয়া, জীবনের অগ্নিক্ষেত্রে পুরুষ-যজ্ঞের বলিরূপে আপনাকে

আহুতি দিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে চায়। সুভাষচন্দ্র যে-দেশে, যে-যুগে, যে-জাতির মধ্যে জন্মিয়াছিলেন তাহাতে সেই অগ্নিক্ষেত্র ও যজ্ঞবেদিকা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। তিনি ছিলেন শাক্ত—বাঙালীর সন্তান, তাই সেই আত্মবলির জন্য একটি দেবীর প্রয়োজন ছিল; ধ্যানকল্পনা বা কবিত্বের দেবী নয়—একেবারে সাক্ষাৎ মৃন্ময়ী মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তিও গড়িয়া লইতে হয় নাই, পূর্ব্বগামী সাধকগণ তাঁহার জন্য গড়িয়া রাখিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি—দেশমাতৃকার সেই ভূলুণ্ঠিত রাজরাজেশ্বরী-মূর্ত্তি তাঁহাকে পাগল করিয়াছিল। তাহারই প্রেমে তিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন—জীবন ও যৌবন তাহাকেই সমর্পণ করিলেন; এমন সর্ব্বত্যাগ আর কেহ করে নাই। এমন একনিষ্ঠ প্রেম, এমন অনন্যময়তা বোধহয় আর কোন দেশোদ্ধারব্রতী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরুষের জীবনে লক্ষিত হইবে না। প্রায়ই দেখা যায়, দেশকে ভালবাসিয়া, দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়া যাঁহারা অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলেরই অপর কোন প্রেম-পাত্র বা পাত্রী ছিল; সুভাষচন্দ্রের প্রেমে পাত্র-ভাগ ছিল না, ঐ এক প্রেম ও এক পাত্র ভিন্ন তাঁহার জীবনে আর কিছুই ছিল না।

কিন্তু ঐ প্রেমও মূলে মানবাত্মারই এক গভীর চেতনা ও বেদনা-প্রসূত। মানুষ-সুভাষচন্দ্রকে না দেখিলে এই প্রেমের সেই মূলটিকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। একদিকে যেমন আত্মার আত্মসম্মানবোধ, অপরদিকে তেমনই সর্ব্ব-অভিমান

ত্যাগ করিয়া অতি দীন-হীন দুঃখী-জনকে বক্ষে আলিঙ্গন করিবার—সেবা করিবার সে কি আকিঞ্চন! শোনা যায়, পথের ধূলা হইতে রোগকাতর কাঙাল বালককে কুড়াইয়া বক্ষে বহিয়া গৃহে আনিতে তাঁহার বাধিত না; এ কাহিনী সুভাষচন্দ্রের পক্ষে আদৌ অসম্ভব নহে। সুভাষচন্দ্র যখন অতিশয় স্বাস্থ্যভগ্ন অবস্থায় মাদ্রাজের জেলে কিছুদিন আবদ্ধ ছিলেন, সেই সময়ে অপর একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বন্দী তথায় ভিন্ন কক্ষে বাস করিতেন। এই বন্দী লিখিয়াছেন, তখন সুভাষচন্দ্র পাকস্থলীর কঠিন ব্যাধিতে মরণাপন্ন, আহার্য্য পথ্য প্রায় কিছুই ছিল না, যাহা ছিল তাহাও তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু সেই অবস্থাতেও তিনি প্রত্যহ নিজহস্তে কিছু-না-কিছু খাদ্য পাক করিয়া, জেলের তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদিগকে আহ্বান করিয়া খাওয়াইতেন, এবং সেই অবকাশে তাহাদিগকে মিষ্টবাক্যে সদুপদেশ দিতেন—নিজে প্রায় অভুক্ত বলিলেও হয়! স্বহস্তে পাক করিতে তিনি ভালবাসিতেন, এবং তাহা অভ্যাস করিয়াছিলেন; তাঁহার মধ্যে যেন একটি মাতৃ-হৃদয় ছিল, এইরূপ পাক করিয়া পরকে খাওয়াইবার আগ্রহ—সেইরূপ স্নেহেরই অভিব্যক্তি। লেখক বলিতেছেন, এই মহাপ্রাণ পুরুষকে তিনি পূর্ব্ব হইতেই পূজা করিতেন, এক্ষণে তাঁহার ঐ শারীরিক অবস্থা, এবং সেই অবস্থায় নিজের ঔষধ-পথ্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, এবং তদুপরি এইরূপ সেবাকর্ম্মের পরিশ্রম দেখিয়া তিনি অশ্রু সম্বরণ

করিতে পারিতেন না—নির্জ্জনে কাঁদিতেন; কিন্তু কিছুতেই সুভাষচন্দ্রকে আত্মরক্ষা বা আত্মকল্যাণচিন্তায় অবহিত করিতে পারিতেন না।

উপরে ঐ যে দুইটি কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছি, উহার মধ্যেই সুভাষ-চরিত্রের আদি-রূপ দেখিয়া লইতে হইবে। সুভাষের দেশ-প্রেম একটা বড় সেন্টিমেণ্ট বা প্রবল হৃদয়াবেগ মাত্র ছিল না, তাহার মূলে ছিল অপার করুণা; করুণা বলিতে দয়া নয়, ইহা সেই অনুকম্পা—যাহাতে দাতাও দানকালে ভিখারীর সমান হয়, সেও যেন যাচনা করে, যেন গ্রহণ করিলে সে কৃতার্থ হয়। এই সুভাষচন্দ্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন! এত বড় প্রেম যাহার তাহার সেই যোদ্ধৃবেশের অন্তরালে কোন্ হৃদয় স্পন্দিত হইতেছিল? সাক্ষাৎ আততায়ী তাঁহাকে বধ করিতে আসিয়া ধৃত হইয়াছে—তেমন ব্যক্তিকেও তিনি আলিঙ্গন করিয়া মুক্তি দিয়াছেন! কতবার যে সামরিক আইন অগ্রাহ্য করিয়া বিশ্বাসঘাতক সেনানীকে ক্ষমা করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়া আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের এক উচ্চ কর্ম্মচারী পরে দুঃখ করিয়াছেন; তাহাতে অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র যখন যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করিতে যাইতেন তখন সেনানিবাসে পৌঁছিয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে নিম্নতম সৈনিকের ভোজনশালায় প্রবেশ করিতেন, এবং নিজে তাহাদের খাদ্য আস্বাদন করিয়া দেখিতেন, তাহা খাদ্য কি অখাদ্য। যুদ্ধশেষে রেঙ্গুন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালের একটি ঘটনাও উল্লেখযোগ্য; তিনি নিজে

'ঝান্সীর-রাণী'—নারীসেনার কয়েকজনকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার গভর্ণমেণ্ট তখন ব্যাঙ্কক শহরে স্থানান্তরিত হইয়াছে, রক্ষীবেষ্টিত সামরিক যানে তথায় তাঁহার গমন করিবার কথা; তিনিই সর্ব্বাধিনায়ক, আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের সর্ব্বস্বধন, তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত। কিন্তু তিনি সে সকল কথা গ্রাহ্য করিলেন না; ঐ কতিপয় নারী-সৈন্যকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য নিজেই, মাথার উপরে শত্রুপক্ষের বিমান হইতে গোলা-বর্ষণ, পথে সাঁতার দিয়া নদীপার, মাঝে মাঝে জঙ্গলে আশ্রয়-গ্রহণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সঙ্কট ও দৈহিক কষ্ট তুচ্ছ করিয়া, তাহাদিগকে বিপদমুক্ত অবস্থায় রাখিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

গীতা বলিয়াছেন—"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ"; পাঠ করিবার সময়ে মনে হয়, ইহাই আদর্শ-চরিত্র বটে, এবং যাহারা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, যাহারা সমাজে থাকিয়াও কর্ম্মত্যাগের সাধনা করে, তাহাদের পক্ষেই এইরূপ আদর্শ-চরিত্র হওয়া সম্ভব। কিন্তু যাহাদিগকে কোন একটি বৃহৎ ব্রত-উদযাপনের জন্য সমাজের সর্ব্বস্তরের সকল পক্ষ ও দলের সহিত ক্রমাগত সন্ধি-বিগ্রহ করিয়া চলিতে হয়, তাহাদের মত ব্যক্তির পক্ষে—'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্'—অর্থাৎ সকল প্রাণীর প্রতি বিদ্বেষহীন হওয়া প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু গীতার এই পংক্তিটিই সুভাষচন্দ্রের চরিত্রকে দৃষ্টান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

গান্ধী-কংগ্রেসের সহিত তাঁহার প্রায় চির-বিরোধ, এবং ত্রিপুরীতে ও তাহার পরে, তাঁহার সহিত সেই দলের ঘোরতর শত্রুতাচরণের কথা আমি সবিস্তারে বলিয়াছি, কিন্তু একটি কথা বলি নাই। আমি সেই ঘটনার আদ্যন্ত অতিশয় সাবধানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু মনের অণুবীক্ষণ-সাহায্যেও আমি সে সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের অন্তরে অণুমাত্র বিদ্বেষ আবিষ্কার করিতে পারি নাই। ইহা বিশ্বাসযোগ্য নয়, নয় বলিয়াই আমিও পরমাশ্চর্য্য বোধ করিয়াছি। পরে বুঝিয়াছি, এই অবিদ্বেষের কারণ কি। যাহার হৃদয় এত বড় প্রেমে বলীয়ান, যাহার দৃষ্টি এত উর্দ্ধে নিবদ্ধ, যে আত্মশক্তিতে এমন আস্থাবান, সে ঐরূপ শত্রুতায় দুঃখ পায় মাত্র—বিচলিত হইবে কেন? সে তাহাকে একটা বাধামাত্র মনে করে, কিন্তু সকল বাধা লঙ্ঘন করাতেই যাহার পৌরুষ—সে তাহাতে ক্ষুণ্ণ বা ক্ষুব্ধ হইবে কেন? আমরা এমন প্রেম ও পৌরুষ দেখি নাই বলিয়াই মনে ঐরূপ সংশয় জাগে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলিয়া রাখি—না বলিলে একটা ভুল ধারণা বড়ই প্রশ্রয় পাইবে। আজাদ-হিন্দ-ফৌজ ও গভর্ণমেণ্টের নেতাজী হইয়াও সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিলেন, অতএব শেষ পর্য্যন্ত তিনি গান্ধী-কংগ্রেসের আনুগত্য করিয়াছিলেন, এইরূপ যুক্তি দ্বারা সুভাষচন্দ্রের পৃথক নেতৃত্ব অস্বীকার করার বড় সুবিধা হইয়াছে। গান্ধীজীর প্রতি সুভাষচন্দ্রের শ্রদ্ধা যে কখনও লুপ্ত হয় নাই ইহা সত্য, কিন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার সেই সমরাভিযান-

কালে গান্ধীজীর প্রতি যে এমন ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার অন্যতর এবং বিশিষ্ট কারণ ছিল। তৎপূর্ব্বে গান্ধী-কংগ্রেস 'কুইট ইণ্ডিয়া' উচ্চারণ করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সম্মুখ-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে—নেতাগণ কারারুদ্ধ হইয়াছেন এবং ভারতে একটা বিপ্লবের ঝড় বহিয়া গিয়াছে; অতএব এই গান্ধী পূর্ব্বের গান্ধী নহেন, সুভাষচন্দ্রের চক্ষে তিনিও তখন বিদ্রোহী ও যুদ্ধার্থী—তাই গান্ধীজীর যুদ্ধঘোষণার মর্ম্ম এবং কংগ্রেসের প্রকৃত অভিপ্রায় পূরাপূরি না জানিয়াই তিনি, এতদিনে তাঁহার নীতিই জয়ী হইয়াছে, এই বিশ্বাসে গান্ধীজী ও তাঁহার কংগ্রেসকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। পরে কারামুক্ত হইয়া গান্ধীজী সেই বিদ্রোহ সম্বন্ধে তাঁহার যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সুভাষচন্দ্র যে জানিতে পারেন নাই, ইহাই তাঁহার সৌভাগ্য; সেই 'কুইট ইণ্ডিয়া'র যুদ্ধঘোষণা-রব আজ কোন্ সুরে নামিয়া আসিয়াছে!

সুভাষ-চরিত্রের আর একটি বড় লক্ষণ অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, কিন্তু হয় ত তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। সুভাষচন্দ্র যে শাক্ত—শক্তির উপাসক, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; কিন্তু সুভাষচন্দ্রের শক্তি-উপাসনা—তাঁহার সেই নারী-পূজাও কম লক্ষণীয় নয়। নারীজাতির প্রতি এমন কামগন্ধহীন শ্রদ্ধা একটি বিশিষ্ট সাধনা-সাপেক্ষ। মনে রাখিতে হইবে, সুভাষচন্দ্র আকুমার ব্রহ্মচারী, তিনি কোন নারীকে—বিবাহ-মন্ত্রে শোধন করিয়াও—কাম-সঙ্গিনী করেন নাই; তাঁহার সেই শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ

যৌন-সংস্কার-মুক্ত। এই ব্যবহারে একাধারে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে যুক্ত হইতে দেখি; একজনের নারী সম্বন্ধে শিশু বা সন্তানবৎ ব্যবহার—বিবাহিত স্ত্রীকেও অন্যভাবে গ্রহণ, আর একজনের নারীকে পুরুষের সমকক্ষরূপে, সহযোগিণীরূপে, সমান মর্য্যাদা-দান। ইহাও সুভাষ-চরিত্রের একটা বড় লক্ষণ—খাঁটি পৌরুষের লক্ষণ। নারীকে এইরূপ শ্রদ্ধা করিতে পুরুষেই পারে—কাপুরুষে পারে না। তথাপি, আমাদের দেশে পুরুষের এই পৌরুষ-লক্ষণ বহুকাল লুপ্ত হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র যে কত বড় পুরুষ—তাঁহার ঐ নারী-পূজাই তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আমি সুভাষ-চরিত্রের যে লক্ষণগুলির উল্লেখ করিয়াছি—তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত পুরুষ-চরিত্রের লক্ষণ, অর্থাৎ মানুষ-সুভাষের পরিচয় তাহাতে আছে। তাঁহার প্রতিভা ও মনীষা, অপূর্ব্ব দক্ষতা বা উপায়-কুশলতা, রাজনীতি ও রণনীতি-জ্ঞান, কর্ম্মে ক্লান্তিহীনতা, বাস্তব-বুদ্ধি ও কল্পনা-শক্তি, এবং সর্ব্বোপরি অজেয় আত্মবিশ্বাস ও অকুতোভয়তা—এ সকল গুণের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ঐ সমগ্র গুণাবলী একত্র করিয়া সুভাষচন্দ্রের দিকে চাহিলে মনে হয় না কি যে, মানব-চরিত্রের উহা একটি অভিনব পূর্ণ-প্রকাশ বটে? সকল কীর্ত্তিকে, সকল জয়-পরাজয়কে, মানব-ভাগ্যের সকল ঘটন-অঘটনকে অতিক্রম করিয়া, উহা যেন স্বমহিমায় বিরাজ করিতেছে। কুরুক্ষেত্রের পার্থ ও পার্থসারথি, বুদ্ধ ও চৈতন্য সকলেই যেন উহার মধ্যে লুকাচুরী খেলিতেছে—পূর্ণতঃ কোন একজন নয়, সকলেরই কিছু কিছু যেন একটি

সূত্রে 'মণিগণা ইব' পাশাপাশি মিশিয়া দীপ্তি পাইতেছে! কিন্তু সেই সূত্র কি? এই সকল গুণ কোন্ একটি গুণকে আশ্রয় করিয়া আছে? সে তাঁহার সেই অতুলনীয়, অপরিমেয় দেশ-প্রেম।

কারণ, আমি সুভাষচন্দ্রের সেই এক রূপ, সেই এক মূর্ত্তি অহরহ আমার মানস-চক্ষে দেখিতেছি। আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক, যোদ্ধৃবেশপরিহিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরের বিশাল প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত সেনাবাহিনী ও সমবেত জনসমুদ্রের সম্মুখে মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান। সে রূপ দেব-সেনানী তারকারি স্কন্দের রূপই বটে! হ্যানিবল, সীজার, আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়নকে কি ঐরূপ উপলক্ষ্যে ঐ বেশে এমনই দেখাইত! নেতাজী তাঁহার মাতৃভূমিকে উদ্ধার করিবার জন্য সর্ব্বস্বপণের সেই শপথপত্র পাঠ করিতেছেন; সেনাগণ তাহাদের অভ্যস্ত সামরিক আচার রক্ষা করিবার জন্য আবেগ রুদ্ধ করিয়া স্থির হইয়া আছে, কিন্তু উদ্বেল জনসমুদ্র স্থির থাকিতে পারিতেছে না—উন্মাদনার ঝটিকাবেগে আন্দোলিত হইতেছে। এমন সময়ে মঞ্চের উপরে নেতাজীর এ কোন্ মূর্ত্তি! শপথ-বাণীর একস্থানে আসিয়া তাহা পাঠকালে হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, তারপর দেহে আর স্পন্দ নাই, চক্ষুতারকা অপলক, সর্ব্বশরীর পাথরের মত কঠিন হইয়া গেছে! একেবারে সমাধিস্থ! সীজার হ্যানিবলের কি এমন সমাধি হইত? এ কি রণোন্মাদের সমাধি? যোদ্ধৃবেশপরিহিত মূর্ত্তি, সম্মুখে বিরাট সৈন্য-প্রদর্শনী,—তাহার মধ্যে এ কি ভাবাবস্থা! দেশের চল্লিশ-

কোটী নর-নারীর দাসত্বমোচন, তাহাদের সেই দুর্বিবষহ দারিদ্র্য ও অসীম দুর্গতি স্মরণমাত্রে সারাপ্রাণে বেদনার বিদ্যুৎ-স্ফূরণ হইল, সেই চল্লিশকোটীর বেদনা একটি মানুষের দেহে নিমেষে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল—সেই পুঞ্জীভূত বেদনার বিরাট স্পন্দনে সারাদেহ নিস্পন্দ হইয়া গেল! কিন্তু এমন সমাধি ত' আর কাহারও হইতে শুনি নাই। প্রায় বিশমিনিট বা অর্দ্ধঘণ্টা ব্যাপিয়া তেমনই অবস্থা—দেহ নিস্পন্দ, চক্ষু পলকহীন; শেষে সেই দেহ স্পর্শ করিলে পর সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। আমি সেই মহাপ্রেমের সেই সমাধি—নেতাজীর সেই মূর্ত্তি আমার মানস-নেত্রে অহরহ দেখিতেছি।

এ মানুষ কি শুধুই 'নেতাজী'? এ যে মানবাত্মার এক নবতন পরিচয়! ভারতভূমি ভিন্ন আর কোন দেশে এহেন রূপ কখনও সম্ভব হইত না। আজাদ-হিন্দ্-সেনার প্রত্যেক নর-নারী এই রূপ দেখিয়াছে, দেখিয়া—'মুক্ত' হইয়া গিয়াছে। নহিলে, তাহারা অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারিত না, নিশ্চিত পরাজয়কে জয়ে পরিণত করিবার এমন বিশ্বাস হৃদয়মধ্যে লাভ করিত না; এবং অতিশয় দুরধিগম্যস্থানে প্রবেশ করিয়া, যুবা ও বালক নির্বিবশেষে, তাহাদের পীড়িত উপবাসক্লিষ্ট দেহের শেষ রক্তবিন্দু ও শেষ নিঃশ্বাস, কেবল 'নেতাজী'-নাম উচ্চারণ করিয়া, এমন হাসিমুখে উৎসর্গ করিতে—এবং তাহাতেই চরম ও পরম শান্তিলাভ করিতে পারিত না। যে-পুরুষকে তাহারা 'নেতাজী'-নাম দিয়াছিল, সে-পুরুষ সকল নামের অতীত;

সে-প্রেমকে কেবল হৃদয়ে অনুভব করা যায়, মুখে উচ্চারণ করা যায় না। তথাপি ঐ নামই তাহার নির্দ্দেশক হইয়াছে, ঐ নামের গুণেই শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইতেছে—ঐ নামই এক মহাশক্তি-মন্ত্রের সমান হইয়া উঠিয়াছে। তৎসত্ত্বেও একথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, ঐ নাম ভারতের মুক্তিদাতা এক মহাশক্তি-সাধকের নাম, প্রেমের এক অপূর্ব্ব শক্তি ঐ পুরুষের রূপে মূর্ত্তি-ধারণ করিয়াছিল। সেই শক্তি অমর, তাহার মৃত্যু নাই—তাই পরাজয় নাই; তাই কোনকালে কোন অবস্থায় 'জয়তু নেতাজী' বলিতে কোন ভারত-সন্তানের কিছুমাত্র বাধিবে না।

জয় হিন্দ

পরিশিষ্ট

আদর্শ-নেতা

(সুভাষচন্দ্রের ইংরেজী রচনার অনুবাদ)

প্রত্যেক জাতির জীবনে এমন একটা সঙ্কট-কাল আসে, যখন তাহাকে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সংকল্প গ্রহণ করিতে হয়। কখনও দুই চারিজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাহা স্থির করেন, কখনও বা উহার ভার একজনের উপরেই পড়ে। যে বা যাহারা সমগ্রজাতির ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তি এইরূপ হাতের মুঠায় লইয়া দাঁড়ায়, তাহারা সেই ভীষণ দায়িত্ব কি উপায়ে পালন করিতে পারে? অতি ধীর ও গভীর চিন্তাসহকারে, অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া, উপায়ান্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অতিশয় সাবধানে ভাল-মন্দ ফলাফল বিচার করিয়া—তবে একটা কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করিতে হয়। কিন্তু এত ভাবনা ও চিন্তা সত্ত্বেও কাজটি দুরূহ হইয়া থাকে। তেমন সংশয়-সঙ্কটে নেতামাত্রেই বুদ্ধির স্থিরতা ও সাহসের দৃঢ়তা-সহকারে কর্ত্তব্য-নির্ণয় করিতে পারেন না। যতই বিজ্ঞ বা বুদ্ধিমান হউন না কেন, উপযুক্ত পরিমাণ জ্ঞানের অভাব হইতে পারে, যত দিক দেখা দরকার এবং যত বিষয় জানা থাকা আবশ্যক, তাহাও সকলের পক্ষে সকল ক্ষেত্রে সম্ভব না হইতে পারে।

আমরা মাঝে মাঝে একটা কথা শুনি এই যে, বুদ্ধি যেখানে হার মানে সেখানে অপর এক বৃত্তি কার্য্যকরী হইয়া থাকে, ইহার নাম—অন্তর্দৃষ্টি, অপরোক্ষ-জ্ঞান (Instinct বা Intuition)। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরুষ-বীরগণ ইহারই বলে ঘোর অন্ধকারে পথ নির্ণয় করিয়াছেন, এবং পরে সেইরূপ কার্য্যের ফলাফল দৃষ্টে প্রমাণ হইয়াছে যে, সেই দৃষ্টি মিথ্যা বা ভ্রান্ত নহে।

ইহা অনেক পরিমাণে সত্য। আমাদেরই সংকীর্ণ অভিজ্ঞতায় আমরা দেশ-বিশেষের নেতাকে ঐরূপ রাজনৈতিক বোধ-বৃত্তির পরিচয় দিতে দেখিয়াছি; তাঁহারা অতিশয় সঙ্কট-মুহূর্ত্তে যেন ঐরূপ একটা উদ্দীপ্ত চেতনার বশে এমন কাজ করিয়াছেন যাহা সে সময়ে অতিশয় দুঃসাহসিক বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনা-প্রমাণে তাহাই অতিশয় সমীচীন বিবেচিত হইয়াছে। এই যে অপরা-বুদ্ধি, ইহা কিরূপ? একহিসাবে উহা একটি জন্মগত-শক্তি। অপর সকল প্রতিভার মত, রাজনৈতিক প্রতিভাতেও একটি সহজাত বোধশক্তি গোড়া হইতে থাকা একান্ত আবশ্যক।

কিন্তু ঐ জন্মগত সংস্কারকেও শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হয়, তাহার জন্য নিরন্তর অনুশীলন চাই। ঐ বোধশক্তি প্রায়শঃ কার্য্যকরী হইলেও, প্রতিবারেই হইবে এমন নিশ্চয়তা নাই। এখন, কোন নেতার পক্ষে সেই সহজাত রাজনৈতিক বোধশক্তিকে স্বচ্ছ ও সুপ্রবুদ্ধ রাখিবার জন্য কি করা উচিত?

প্রথমতঃ তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হইতে হইবে; সজ্ঞানেই হোক, আর অজ্ঞানেই হোক, কোনরূপ স্বার্থচিন্তাযুক্ত হইলে ওই দৃষ্টি আর স্বচ্ছ থাকিবে না, তখন তাহা নেতাকে পথের পরিবর্ত্তে বিপথে চালিত করিবে। ঐ বোধশক্তির উপরে যখন অহংবুদ্ধি জয়ী হয় তখন বিনাশেরও আর বিলম্ব নাই। অতএব একটা জাতির ভাগ্য লইয়া খেলা করিবার সময়ে—মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব—স্বার্থশূন্য হইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, নেতামাত্রকেই নিজ ব্যক্তি-চেতনাকে গণ-চেতনার সহিত এক করিয়া ফেলিতে হইবে, তাহা না হইলে, গণ-চিত্তের বিরাট সংবেদন নেতার সেই বোধশক্তিকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবে

না। সাধারণ মানুষের পক্ষে ইহা সহজ নয়। সৌভাগ্যক্রমে এমন দুই একজন মানুষ থাকেই যাহারা জনগণের ঐ চেতনার সহিত নিজেদের ব্যক্তি-চেতনা সহজেই মিলাইয়া লইতে পারে, এবং সেই হেতু তাহারা জনমনের গতি ও প্রকৃতি ঠিকমত উপলব্ধি করিতে পারে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই জানি যে, যে-নেতা এই জনচিত্তকে যত অধিক বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনি তত অধিক শক্তি ও সাফল্যের অধিকারী হইয়াছেন। জনচিত্তের সহিত এইরূপ যোগ-স্থাপন কেবল বুদ্ধির আয়ত্ত নহে, ইহার জন্য সেই অন্তঃশীলা বোধ-বৃত্তি চাই।

নেতার সেই মনকে এমন শুদ্ধ ও সংযত করা সম্ভব, যাহাতে গণ-চিত্তের সঙ্গে উহা একসুরে বাঁধা হইয়া যায়। কিন্তু ইহার জন্য অবিরাম সাধনা ও সতর্কতা চাই। মনে কর, পর্ব্বত-রন্ধ্রপথে একটা জলস্রোত প্রবলবেগে নির্গত হইতেছে, উহার অন্তর্গত প্রত্যেকটি জলকণা কি ঐ প্রপাতের সঙ্গে একই বেগে একই ছন্দে বহিতেছে না? বের্গসঁ-র (Bergson) সেই 'জীবনাত্মিকা অনাদ্যন্ত গতিধারা'র (Elan Vital) কথা চিন্তা কর, মানুষের চিৎ-সত্তা কি সেই বিশুদ্ধ 'সৎ'—সেই গতি-সত্তার মধ্যে অবতরণ করিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিতে পারে না? হেগেলের (Hegel) সেই অদ্বিতীয় 'মহা-তত্ত্ব' (Absolute Idea) যাহা সৃষ্টির পর্ব্বে পর্ব্বে অভিব্যক্ত হইতেছে—মানুষের ব্যক্তি-চেতনা কি সেই তত্ত্বে নিমজ্জিত হইয়া তাহার সহিত এক হইয়া যাইতে পারে না? অথবা, আমাদের তন্ত্রের সেই এক 'পরমা শক্তি'—যাহার নিত্য-নব রূপান্তর এই জগৎ—মানুষের আত্মা কি ভাব-যোগে সেই শক্তিকে হৃদ্‌গত করিতে পারে না?

সেইরূপ, গণ-চিত্তের সহিত ব্যক্তি-মানসের যোগসাধনও সম্ভব;

কিন্তু ঐ যে-বৃত্তির দ্বারা তাহা হইয়া থাকে তাহাকে ঠিক পথে চালনা না করিলে, এবং শাসনে না রাখিলে,—বস্তুজ্ঞানহীন তত্ত্ববাদ (mysticism) তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে ; এজন্য জগৎ-সংসার ও মনুষ্য-জীবনসংক্রান্ত যে বাস্তব নিয়তি-নিয়ম তাহার জ্ঞানকে যুক্তিধর্ম্মী মনের দ্বারা সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিতে হইবে। অতএব, তৃতীয়তঃ, ঐরূপ নেতার কর্ত্তব্য হইবে—যুক্তি-বিচার ও বিশ্লেষণ পূর্ব্বক অতিশয় বিস্তারিতভাবে ইতিহাস-পাঠ। মানুষের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও যেখানে বন্ধ্যা সেখানে ঐ বোধ-শক্তি (Intuition) যেমন আমাদের সহায় হইয়া থাকে, তেমনই ঐ অন্তর্দ্দৃষ্টি যখন অবাস্তব-তত্ত্ববাদের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়, তখন যুক্তিধর্ম্মী জ্ঞানই তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে।

চতুর্থতঃ, দেশের রাষ্ট্রীয় ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করিবেন সেই নেতা, পৃথিবীর অপর সকল রাষ্ট্রে সেইকালে কি ঘটিতেছে সে-দিকে লক্ষ্য রাখিবেন ও তাহার অর্থ উত্তমরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। কারণ, এ যুগে সারাপৃথিবী একই ভাগ্য-রজ্জুতে বাঁধা, একের চাপ বা আকর্ষণে অন্যের অবস্থান্তর ঘটিবেই। অতএব নেতার যদি অপর সকল গুণও থাকে, তথাপি এই আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচয় যদি সম্পূর্ণ ও যথার্থ না হয়, তবে তাঁহার নেতৃত্ব নিষ্ফল হইবে।

সুভাষচন্দ্রের কয়েকটি উক্তি ও মন্তব্য

(উক্তিগুলির ইংরেজীর অনুবাদ দিলাম না—অধিকাংশ স্থলে সেইরূপ উন্মোচন সুখকর নহে)

গান্ধী-কংগ্রেসের নীতি ও প্রকৃত অভিপ্রায়

"When the coast is clear federation will steam in and will be welcomed by the prospective ministers with drums beating and colours flying—not the colours of the Indian National Congress, but of the British Empire which stands for peace democracy and progress."

[বর্ত্তমানে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহার ভিতরটা ঠিক আছে, কেবল নামগুলা ভিন্ন—বুলির চটকে ভিতরটা ঢাকিবার চেষ্টা হইতেছে।]

* * *

"Have we yet to realise that pilgrimages to New Delhi will not bring us to our goal? . . .

Meanwhile may we not appeal to Mahatma Gandhi to give up these long and tiresome journeys to Viceroy's House and to come and stand at the head of his countrymen as he did in 1920?"

[সুভাষচন্দ্রের এ কি কথা! দিল্লী-সিমলার বৈঠকখানায় বড়দের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়াই ত' এতদিনে স্বাধীনতার সিংহদ্বারের কপাট খুলিয়াছে। অবিশ্বাসী সুভাষ! গান্ধীজী ইংরেজ জাতিকে, বিশেষ

করিয়া ঐ মন্ত্রীমিশন, এবং আরও বিশেষ করিয়া বড়লাট ওয়াভেলকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই ত' স্বাধীনতাটি এমন নির্ব্বিঘ্নে লাভ করা গেল, এখন হজম করিতে যা একটু কষ্ট !]

* * *

"Why do they talk big? Lengthy resolutions, high-sounding phraseology, frothy speeches, periodic doses of bellicose utterances, frequent references to a new order that need not be fought for, but will fall from the skies—Imperialism crashing under its own weight—all these fit in with what we know as Kerensky-tactics and ill accord with the demands of 'Real-Politik.'"

[পণ্ডিত জবাহরলালের গগন-বিদারী বক্তৃতার হুবহু বর্ণনা। এই 'Kerensky-tactics' গান্ধী-কংগ্রেসের একটি বড় অস্ত্র—ভাড়াটিয়া ভীমের গদা-আস্ফালনে এখনও আসর জমাইয়া রাখিয়াছে। আরও আসবাব-আয়োজন আছে ; বৈঠকখানায় নেহেরু-কৃপালনীর দল, কখনো বীর, কখনো করুণ, কখনো শান্ত রসের ঢেউ তুলিয়া মুগ্ধ দর্শক-মণ্ডলীকে 'আঙ্কোর'-রবে মুখর করিতেছে (প্রতিশ্রুতির আস্ফালন আছে, কার্য্যের কোনরূপ নির্দ্দেশ নাই !) ঠাকুরঘরে বসিয়া গান্ধীজী ভাগবত-পাঠ করিতেছেন, সেখানে অহিংসা ও নিষ্কাম কর্ম্মের অপূর্ব্ব অনুপ্রেরণা-সঞ্চার হইতেছে, অর্থাৎ, এমন কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইতেছে যাহা দেহধারী জীবকে সর্ব্ব কর্ম্মবন্ধন-মুক্ত করে ; এবং ভাঁড়ার-ঘরের চাবি কোমরে বাঁধিয়া সর্দ্দার পাটেল অতিশয় কঠিন মূর্ত্তিতে গৃহস্থালী রক্ষা করিতেছেন ; বৈঠকখানা বা ঠাকুর-ঘরের সঙ্গে

তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই—বক্তৃতা প্রভৃতি বাহিরের জন্য, ভিতরে সব ঠিক আছে।]

* * *

"They are afraid that if and when a struggle is launched the leadership will pass out of their hands. Hence avoid a struggle by all means, try to keep whatever power you have already won and work for more through antechamber conferences and negotiations."

[এই জন্যই যখন যেখানে প্রকৃতিপুঞ্জ বা কোন সমাজ সত্যকার কারণে—মনুষ্যধর্ম্ম ও স্বভাবের বশে—পৃথকভাবে অসহ্য অবস্থার প্রতিবিধান করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেইখানেই, নিজে কোনরূপ সংগ্রাম করিবে না অথচ নেতৃত্বও ত্যাগ করিবে না বলিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই পৃথক কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরে বিনাশ করিবার জন্য, সে তাহার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে।]

"It has agreed to separate electorate knowing what its consequences would be."

[এখানে ঐ 'knowing' শব্দটা বড়ই অর্থপূর্ণ; অর্থাৎ, জানিয়া-শুনিয়া সে এই কাজ করিয়াছে। তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে তাহার মতলব কি ছিল? তাহার পরে, এবং এখনও পর্য্যন্ত, সে কি, সেই মতলবটিই দিন-দিন ফলোন্মুখ হইয়া উঠিতেছে দেখিয়াও, নিশ্চিন্ত-নিরুপায় হইয়া থাকে নাই? এখন সাধু সাজিয়া, মুখে সেই অপরাধ স্বীকার

করিলে কি হইবে? ইহার জন্য সমগ্রজাতির নিকটে গুরুতর জবাবদিহি আছে।]

* * *

"The Working Committee are anxious to find any excuse or justification for postponing the struggle *sine die*. In future we shall probably hear of more messengers coming from Great Britain with frequency and regularity."

[হাঁ, আসিয়াছে, আসিতেছে, এবং আরও আসিবে—যতদিন না কংগ্রেস পূরা স্বাধীনতা লাভ করে। এই দিব্যজ্ঞানের জন্যই ত' সুভাষচন্দ্র ঘরে-পরে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন।]

* * *

"The Rightists entertain hopes of a compromise with British Imperialism, or of getting back to power in the provinces."

[উহাই যে কংগ্রেসের স্বর্গলাভ, উহাই স্বাধীনতা, উহাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি—তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? অনেক সাধ্য-সাধনায় ওইটুকু সে লাভ করিয়াছে, এখন তাহা রক্ষা করিবার জন্য জাতি-কুল-মান সকলই বিসর্জ্জন দিবে। দিল্লীর মসনদে বসিয়া সর্দ্দার পাটেলের মতি-গতি যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?]

কংগ্রেসের ধর্ম্মচ্যুতি—তাহার কারণ

"The tragedy that has overtaken the upper ranks of the Congress leadership is due

primarily to demoralisation that followed in the wake of office-acceptance. . . .

Lust for power has seized the upper ranks of our leadership—not the power that follows from Independence, but such power as will come through a compromise with Imperialism."

[প্রথম বাক্যটিতে, সুভাষচন্দ্র যাহা পরে ঘটিয়াছে বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উদারতাই প্রকাশ পাইয়াছে। আসলে ঐ office-acceptance-এর লোভ পূর্ব্বেই এমন দুর্দ্দমনীয় হইয়াছিল, আপাত-কর্ত্তৃত্বের সেই সামান্য ক্ষমতাটুকুও এমন পরমার্থ বলিয়া মনে হইয়াছিল যে, তাহারই জন্য 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র এমন সাংঘাতিক সর্ত্তেও রাজী হইতে বাধে নাই—'না-গ্রহণ না-বর্জ্জন'রূপ একটা কথার ভেল্কির দ্বারা তাহাকে ঢাকিয়া লইতে হইয়াছিল।]

নেতৃত্বের ন্যায়সঙ্গত অধিকার

"A nation feels grateful for a leader's past services and may love him for the same . . . Past suffering and sacrifice can never be a passport to future leadership under all circumstances. . . .

"In a nation that has been enslaved or suffers from a slave-mentality, it is somewhat different. Once leaders ascend the pedestal they do not feel like retiring voluntarily. In such a country, the people are prone to blind hero-worship and take more time to be dis-

illusioned than elsewhere. But the evil day can nowhere be put off indefinitely. In the fulness of time, the naked truth ultimately stands unmasked."

[এ কথা যে কত সত্য তাহা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছি ; কিন্তু এ ত' শুধুই hero-worship নয়, এ যে অবতার পূজা ! এ মোহ এ জাতির পক্ষে কি সহজে ভাঙে !]

প্রেসিডেন্ট-নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের কু-নীতি

" A unanimous election as a matter of fact is possible only when the opinion in the country is not divided, but when it is fought on the basis of definite policies and programmes the plea for unanimous election is quite out of the question. . . . As in other free countries, the presidential election in India should be fought on the basis of definite problems and programmes."

[উপরের ঐ উক্তিগুলি হয় ত' ঠিক হয় নাই, কারণ, কংগ্রেস গণ-মতের প্রতিনিধির দ্বারাই তাহার সকল কার্য্য অনুমোদিত করিয়া লয়। ঐ প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন প্রভৃতি সকল কর্ম্মেই সে যে নীতি প্রচলিত করিয়াছে তাহার সৌরভে দশদিক আমোদিত হইতেছে ; ঐ নীতির ফলেই, দেশের সর্ব্বত্র সকল ছোট-বড় কংগ্রেস-কমিটিতে ধর্ম্মের যে ঝড় বহিয়া থাকে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কংগ্রেস যে একটি খাঁটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, ব্রিটিশ সরকারের সহিত রফা করিয়া সে যে শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতেছে তাহা যে জন-গণ-অনুমোদিত,

এ কথা সে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকে। অথচ জনগণ তাহার কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না; যদি অবস্থাবিশেষে পড়িয়া তাহা বুঝিতে চায়, তবে ধমক খাইয়া নিরস্ত হয়, বলিবার যো নাই যে, এমন ব্যবস্থায় কেন স্বীকৃত হইয়াছিলে? এমন অদ্ভুত গণতন্ত্র কোন্ দেশে আছে? কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্টও যে তেমনই জন-গণ-নির্ব্বাচিত, তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ—বড় কর্ত্তারা যাহাকেই খাড়া করেন, তিনিই নির্ব্বাচিত হন;—unity ও discipline-এর কি মহিমা! ইংরেজ-প্রভুদেরই যত দোষ!

নকল গণ-পরিষৎ

"What has caused us the greatest concern is not the unfair and improper tactics, but the substitution of the national demand for what I call a faked Constituent Assembly.

. . . We feel astounded that it does not strike our elderly leaders that before they could sit down to frame a Constitution they should first win the right to do so. Have they, we ask, secured that right? No.

It will ultimately break up in disorder and the enemies of India will point their fingers at the Congress as the real author of the tragedy."

[এই ভবিষ্যৎ-বাণী ফলিতেও আর বিলম্ব নাই। তথাপি, গণ-পরিষৎ আহ্বান করার অধিকার সে অর্জ্জন করে নাই—সুভাষচন্দ্রের এমন কথা নিশ্চয়ই অপমানজনক। সে যে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াই ব্রিটিশ-সিংহকে পরাস্ত করিয়াছে, তাহা কে না স্বীকার করিবে?

আগষ্ট-বিদ্রোহ ত' সে-ই করিয়াছিল, আজাদ-হিন্দ-ফৌজের বিচার ও তজ্জনিত আন্দোলনে ভারতীয় সৈন্যদলে—নৌ-বিভাগে পর্য্যন্ত যে অশান্তি দেখা দিয়াছিল, তাহাও ত' কংগ্রেসের দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের ফলে। সেই সকল বীরত্ব এবং ভবিষ্যতে তাহার বৃহত্তর পুনরভিনয়ের ভয় দেখাইয়া পণ্ডিত নেহেরু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে যেরূপ ত্রাসযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাই ত' যথেষ্ট, তাহাতেই ত' ইংরেজ পরাজিত হইয়াছে; সেই জয়লাভের অধিকারেই ত' কংগ্রেস বুক ফুলাইয়া গণ-পরিষদ দাবী করিয়াছে, এবং একটি অতিশয় খাঁটি গণ-পরিষদ আহ্বান করিতেছে!]

সুভাষচন্দ্রের নিজ অভিপ্রায় ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ

"They (his followers) may win Swaraj or they may not. But one thing is certain. They will have the satisfaction of having done their duty when others failed. They will be upholding the honour of the Indian Nation at home and abroad. . . . Whether Independence is won by one stroke or not, the grave of Rightism will be dug once for all, and Leftism will be firmly rooted on Indian soil."

[জয়তু নেতাজী !]

গান্ধীজীর নেতৃত্ব নিষ্ফল হইয়াছে কেন ?

"He has failed because the strength of a leader depends not on the largeness but on the

character of his following. With a much smaller following other leaders have been able to liberate their country.

" He has failed because while he has understood the character of his own people, he has not understood the character of his opponents. The logic of a *Mahatma* is not the logic which appeals to John Bull.

"He has failed because the false unity of interests that are inherently opposed, is not a source of strength but a source of weakness in political warfare. The future of India rests exclusively with those radical and militant forces that will be able to undergo the sacrifice and suffering necessary for winning freedom.

" Last but not least, the Mahatma has failed because he has had to play a dual role in one person—the role of the leader of an enslaved people and that of a world-teacher, who has a new doctrine to preach."

[মহাত্মা যে ভারতবাসী জনগণের চরিত্র ভালরূপ বুঝিয়াছেন—তাহাই ত' তাহাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে, সেই জন্যই ত' তিনি 'মহাত্মা' হইতে পারিয়াছেন। হাজার বছর ধরিয়া যাহারা আফিমের নেশা করিয়াছে তাহাদিগকে কোন্ বস্তুটি দিলে কৃতার্থ হইয়া যায়, ইহা গান্ধীজী খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলেন। উপরে আর যে

কথাগুলি আছে, তাহাতে সুভাষচন্দ্র অতি-গভীর তত্ত্ব-দৃষ্টি ও রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন—কথাগুলি এতই মূল্যবান যে তাহার অনুবাদ না দিয়া পারিলাম না—

"গান্ধীজীর ব্যর্থতার প্রথম কারণ—নেতার শক্তি নির্ভর করে অনুচর-সংখ্যার উপরে নয়, পরন্তু সেই অনুচরবৃন্দের প্রকৃতি বা চরিত্রের উপরে।' গান্ধীজীর অপেক্ষা বহুগুণ অল্প অনুচর লইয়াও অপরাপর নেতা স্বদেশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন!

"দ্বিতীয় কারণ,—তিনি নিজ দেশীয় জনগণের চরিত্র যেমন বুঝিয়াছেন, প্রতিপক্ষ বা ইংরাজ-জাতির চরিত্র তাহার তুলনায় কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই—একজন 'মহাত্মা' যেরূপ যুক্তিকে আশ্রয় করেন, 'জন বুল' তাহাতে ধরা দেয় না।

"তৃতীয় কারণ—যে সকল ক্ষেত্রে স্বার্থ-বিরোধ অতিশয় মূলগত সেখানে একটা কৃত্রিম ঐক্য-স্থাপনের চেষ্টা করিলে রাজনৈতিক সংগ্রামে শক্তিবৃদ্ধি না হইয়া শক্তিক্ষয় হইয়া থাকে। ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য তাহারাই স্থির করিবে যাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনচিত্ত ও সংগ্রামশীল, এবং সেইজন্য স্বাধীনতা-অর্জ্জনের জন্য সর্ব্বপ্রকার কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার করিতে সমর্থ।

"সর্ব্বশেষ কারণ এবং তাহাও সামান্য নয়—এই যে, তিনি একই-কালে দুইটি বিপরীত ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন—দাসত্বমোচনের জন্য একটি পরাধীন জাতির নেতৃত্ব, এবং পৃথিবীতে একটি নবধর্ম্ম-প্রচারের জন্য জগৎ-গুরুর ভূমিকা"]।

গান্ধীজী কিরূপ নেতা

"In many ways he is an idealist and a visionary. In other respects he is an astute

politician. At times he is obstinate as a fanatic, on other occasions he is liable to surrender like a child. The instinct, or the judgment so necessary for political bargaining is lacking in him. . . . Born in another country he might have been a complete misfit. . . . His doctrine of non-violence would have led him to the cross or to the mental hospital."

[এই উক্তি তাঁহার যে গ্রন্থে আছে তাহার প্রকাশ-কাল ১৯৩৪ সাল; গান্ধী-চরিত্রের বিকাশ বা পূর্ণতর পরিচয় তখনও বাকি ছিল, তখনও ত্রিপুরীর বিলম্ব আছে। শেষের দিকে ঐ যে, 'mental hospital'-এর উল্লেখ আছে, এক্ষণে উহার আর প্রয়োজন নাই, গান্ধীজী সারাদেশটাকেই সেইরূপ হাসপাতালে পরিণত করিয়া তন্মধ্যে অতিশয় স্বচ্ছন্দে বিচরণ ও বাস করিতেছেন।]

